দাম ঃ ৬.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬ জুলাই - ২০০৯ ● শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা - ১৪১৬

- অন্যায়ের প্রতিবাদ করো
- প্রতিরোধ করো
- প্রয়োজনে প্রতিশোধ নাও

সূচীপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ● ৭

■ **যুগাচার্য প্রণবানন্দজী ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ** ❖
স্বামী যুক্তানন্দ ● ৮

■ **১৯৪৬ - শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, ২০০৯ - শ্যামাপ্রসাদ নাই হিন্দুদের পরিত্রাতা কে?** ❖
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ● ১৩

■ **প্রতিবাদী শ্যামাপ্রসাদ** ❖ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ১৭

■ **শহীদ শ্যামাপ্রসাদ** ❖ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় ● ২৩

■ **স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতির রূপকার শ্যামাপ্রসাদ** ❖
এন সি দে ● ২৭

■ **বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক** ❖
নবকুমার ভট্টাচার্য ● ৩১

■ **যুবসমাজের দৃষ্টিতে শ্যামাপ্রসাদ** ❖
প্রাণ প্রতিম পাল ● ৩৭

■ **ভারত কেশরীর কারাসঙ্গী প্রেমনাথ ডোগরা** ❖
ভগবত স্বরূপ ● ৩৯

■ **মাওবাদী, সিপিএম ও কেন্দ্রীয় সরকার** ❖
নিশাকর সোম ● ৪১

■ **জম্মুতে শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস** ❖ ৪৭

■ **পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিমূর্তি** ❖ ৪৯

প্রচ্ছদ পরিচিতি— জম্মুতে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় মঞ্চে রয়েছেন চমনলাল গুপ্তা (বাঁদিক থেকে), সুচেত সিং, অশোক খাজুরিয়া, সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং এবং কেদারনাথ সাহানী।

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ **অজিত ভকত**

।।দাম ৬টাকা।।

Registered No.-SSRM/Kol.RMS/W.B/RNP-048/2007-09

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. - SSRM-KOL.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫,

টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : vijoy.adya@gmail.com
swastika5915@bsnl.in

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। **বিজয় আঢ্য**

সহযোগী ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য।

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা - ১৪১৬

৬১ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা

২১ আষাঢ় , ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১১

৬ জুলাই, ২০০৯

সম্পাদকীয়

শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক উত্তরসূরী

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১০৮ তম জন্মবর্ষে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ, বর্তমানে বিবর্তিত ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে দেশ শাসন করিবার জনাদেশ লাভ করিতে পারে নাই। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্যই হইল দলীয় আদর্শের জনভিত্তি মজবুত করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। এই বিচারে বিজেপি পিছাইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকিতেই পারে, ইহা কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরী বলিয়া যাহারা দাবী করিয়া থাকেন, তাহাদের সাম্প্রতিক আচার-আচরণ ও কথাবার্তা জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত নাগরিক সমাজকে শুধু বিস্মিতই করে নাই, বেদনাবিদ্ধ ও করিয়াছে। একদা যে দল জাতীয় স্বার্থে দলীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া জনতা পার্টিতে সামিল হইয়াছিল, তখনও তাহারা নিজস্ব আদর্শ বিসর্জন দেয় নাই। 'ডুয়েল মেম্বারশিপ'-এর প্রশ্নে আপোষ করে নাই। নিজেদের আদর্শকে অনির্বাণ রাখিবার জন্য নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করে নাই।

বস্তুত হিন্দুত্বের প্রেরণায় উদ্দীপিত প্রদীপটিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া ডঃ মুখার্জী যে জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অর্ধশতকের অধিক কাল পথ পরিক্রমন করিয়া পদ্মফুলের মতো তাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, দেশব্যাপী হইয়াছে। 'ন্যাশনাল আইডেনটিটি' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই বিজেপি-কে এই বিকাশে তথা রামজন্মভূমি আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং পরিণামে কেন্দ্রে সরকার গঠন করিয়া দেশ-শাসনের অধিকার অর্জনে সামর্থ্য যোগাইয়াছে।

আধুনিক ভারতের প্রায় সকল বরেণ্য পুরুষই, যেমন যোগী শ্রীঅরবিন্দও 'সনাতন ধর্মই ভারতের জাতীয়তা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কয়েক বছর আগে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট-ও এক নির্বাচনী মামলার রায়ে বলিয়াছেন, হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়, হিন্দুত্ব হইল একটি জীবন পদ্ধতি (ওয়ে অফ লাইফ) এবং এদেশের সাধারণ সংস্কৃতি (কমন কালচার অফ ইন্ডিয়া)। 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' — এই সংস্কৃতির ভিত্তি যা আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সকলকে সম্মানের সহিত থাকিবার কথা বলে। হিন্দুত্ব কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এই সত্যকে স্বীকার করিবার মানসিকতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লোকেদের থাকা উচিত।

ঘটনা হইল, সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিজেপি-কে আধুনিক হইতে কেহ কেহ এই হিন্দুত্ব বর্জনের প্রেসক্রিপশন ধরাইয়া দিতেছেন। বরুণ গান্ধীর বেদনাকে নয়, বাক্‌ভঙ্গিকেই গুরুত্ব দিয়া 'হেট স্পীচ' বলিয়া পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করিতেছেন। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই মুসলিম তোষণ নীতির মানসিকতাই ষাট বছর আগে দেশকে বিভাজনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল, আজও তাহা অব্যাহত। দেশের সম্পদের উপর প্রথম দাবী সংখ্যালঘুদের (পড়ুন মুসলিমদের) — খোদ প্রধানমন্ত্রী একথা ঘোষণা করিয়াছেন। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় নাই। রামজন্মভূমিতে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং সমান নাগরিক আইন প্রভৃতি জাতীয় ইস্যুগুলিকে কার্পেটের তলায় ঢুকাইয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ বিজেপি যে নীতি ও আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া রাজনীতি করিতেছে, তাহা বর্তমান ভারতে একটি বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্য দিয়া নৌকা বাওয়ার মতো কঠিন কাজ। তাই হিন্দুত্ব বা সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদকে পরিত্যাগ নয় — রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরীদের আত্মঘাতী সমালোচনা ও পারস্পরিক আক্রমণ অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন আত্মসংহতি।

বাঙালী হিন্দুর রক্ষাকর্তা
যুগাচার্য প্রণবানন্দজী ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

স্বামী যুক্তানন্দ

অনেক ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি আছেন, যাঁরা স্বামী প্রণবানন্দজী ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেই জানতে আগ্রহী হন — তাঁদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কি? উভয়ের প্রতি উভয়ের এত আকর্ষণই বা কেন? এই প্রবন্ধ রচনার মূলেও কিন্তু তেমনই জিজ্ঞাসা।

অবশ্য বিষয়টি বহু চর্চিত। ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর মুখপত্র প্রণবে এ বিষয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। সঙেঘর একাধিক গ্রন্থে সে প্রসঙ্গ এসেছে। এমনকি সঙেঘর বাইরেরও কোনও কোনও গ্রন্থেও ওই আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে। ঠাঁই পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ একজন যেমন ভারতীয় অধ্যাত্ম-গগনকে আলোকিত করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী রূপে কাজ করেছেন, তেমনি অন্যজন সমাজ সেবার পাশাপাশি বিপন্ন হিন্দুর পরিত্রাতা রূপে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তাই হিন্দুর কথা বলতে, হিন্দুধর্ম-হিন্দুসমাজ-হিন্দু সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে সাদৃশ্যপূর্ণ দুই চরিত্র প্রণবানন্দ ও শ্যামাপ্রসাদের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই এসে যায়।

আশ্রমে আসিয়া স্বীয় বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলে যখন আমি তাঁর গায়ের জামাটা খুলিয়া দিতেছিলাম, তখন তিনি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন — "বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিলাম।"

শ্যামাপ্রসাদবাবু প্রণবানন্দজীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের — এমন কথা জোর দিয়ে বলার মতো তথ্য এখনও পর্যন্ত লেখকের হাতে নেই। তবে প্রণবানন্দজী আধ্যাত্মজীবনে সাফল্য লাভের জন্য শ্যামাপ্রসাদের কানে মন্ত্র না দিলেও হিন্দু ও তার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য তাঁর প্রাণে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন — তা শ্যামাপ্রসাদবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন। সঙঘ প্রকাশিত ও স্বামী আত্মানন্দজী সম্পাদিত "মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ' গ্রন্থে তাঁর আড়াই পাতার ছোট্ট নিবন্ধে সে কথাই প্রকাশিত। তিনি সেখানে লিখেছেন —

"আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা।"

তাছাড়াও ওই নিবন্ধে ভারত সেবাশ্রম সঙঘ ও সঙঘ প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী সম্পর্কে তিনি নিজ অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কথাগুলি বলেছেন —

"বর্তমান সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সঙঘ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির দেহে শক্তিসঞ্চার কার্য্যে অগ্রণী হইয়া ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় ভারতের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন। আমাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তাকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ, ভারতের নিজস্ব ধর্ম্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিন্দুধর্মের স্বর্ণ পেটিকার মধ্যে সুরক্ষিত আছে, তাহার পুনঃপ্রচার করিতে হইবে। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙঘ সেই হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচারের পবিত্রকার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। হিন্দুধর্মের যে দিকটা কেবল মনন ও নিয়ম পালন লইয়াই ব্যাপৃত, ঘটনাচক্রে এবং অদৃষ্টদোষে বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত উদ্যম সেই দিকেই ব্যয়িত হইতেছিল। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, যুগ পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেক হিন্দুকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে। হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত অবশ্য পালনীয় বীরব্রতের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করিয়া আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বামীজী প্রচলিত অঙ্গ হীন হিন্দু ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন — হিন্দুজাতিকে যুগোচিত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। তাঁহারই দূরদৃষ্টি বহু পূর্বে হিন্দু সমাজের রক্ষা ও সংগঠন কল্পে মিলনমন্দির ও রক্ষিদল গঠন আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিল। তাঁহারই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ফলে শক্তি সমন্বিত এই ভারত সেবাশ্রম সঙঘ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' সম দুর্বল ও

লাঞ্ছিত হিন্দুকে বিপদে উন্নতশির হইতে শিক্ষা দিতেছেন, ছিন্ন ভিন্ন ও আত্মকলহপরায়ণ হিন্দু-সমাজকে সংগঠিত একতাবদ্ধ হইবার পথ দেখাইতেছেন। দুঃস্থ ও বিপন্ন হিন্দুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, স্বদেশে বিস্মৃতিমগ্ন হিন্দুকে তাহার ধর্মের ও সভ্যতার গৌরবগাথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর উপদেশ ও অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বাণী বহনকারী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পৃথিবীর দূর-দূরান্তে অবস্থিত স্থান সমূহে হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের অভ্যন্তরে গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে সঙ্ঘ জাতির সেবাকার্য্যে যেমন তৎপরতা ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন, সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্ব আফ্রিকাতেও তেমনি হিন্দুধর্মের মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত অনগ্রসর ও অনাদৃত অঞ্চলে হিন্দুধর্মের নাম

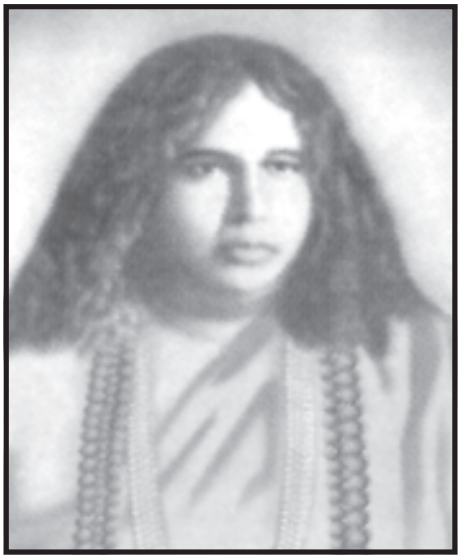

স্বামী প্রণবানন্দ

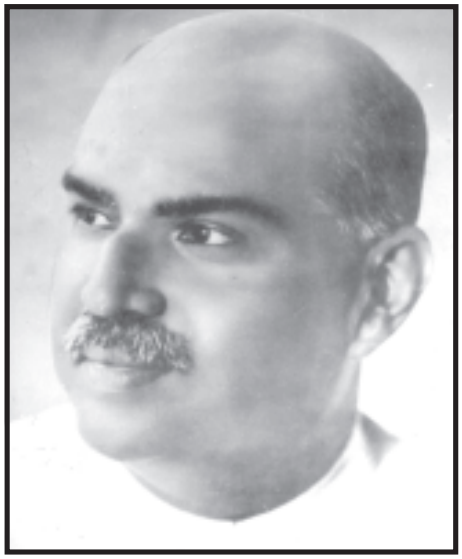

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

পর্য্যন্ত শুনে নাই, হিন্দু সন্ন্যাসীর পবিত্র গৈরিক বসন চক্ষে দেখে নাই, আজ সেখানকার জনগণ শাশ্বত সনাতন বেদবাণী শ্রবণ ও নির্ম্মল আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমার মনে হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ — সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দেশকে ও জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই। ভবিষ্যতের জ্যোতির্ময় ভারতের দিব্যদ্রষ্টা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমি আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যে আমরা জেনেছি — তিনি কয়েকবারই সঙ্ঘের আহূত সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। আহূত সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল — হিন্দুজাতি ও হিন্দু ধর্ম বিষয়ে।

শ্যামাপ্রসাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে প্রথম কখন আসেন, কি উপলক্ষে আসেন, কোন কোন দিন বা তারিখে আসেন তা বিস্তারিতভাবে এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে স্বামী বেদানন্দজী লিখিত শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবন চরিত অবলম্বনে বলা যায় তিনি সঙ্ঘে প্রথম আসেন — ১৯৪০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে। প্রণবানন্দজী ও তাঁর সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীগণ তখন দেশব্যাপী, বিশেষত বাংলাব্যাপী হিন্দুজাতিগঠন আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে হিন্দুর সুরক্ষায় হিন্দু মিলন মন্দির ও হিন্দুরক্ষি দলের গঠনের কাজে ব্যাপৃত। সে সময়ে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে ওই বিষয়ের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্বামী বেদানন্দজী লিখেছেন —

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাস। আচার্য্যের আদেশে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতি বৎসরের মতো সেবারও কলিকাতার বালিগঞ্জে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন কর্তা ছিলেন স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি, সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

সম্মেলনের পাঁচদিন পূর্ব থেকে আচার্য্যদেবকে বড় বেশি উদ্বিগ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তখন তাঁহার আতঙ্কের ভাবটি সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। পরে বুঝিয়েছিলাম যে আসন্ন মহাধ্বংসের বিভীষিকা হইতে বাংলা ও বাঙালী জাতির রক্ষার আকুল আবেদনে যখন বাঙ্গলার কোনও নেতা বা ধনী সাড়া দিলেন না, তখন তিনি মনে মনে শ্যামাপ্রসাদকেই স্বীয় সঙ্কল্পসাধনের মাধ্যম (medium) নির্বাচন করিলেন।

তিনি পর পর পাঁচ দিন শ্যামাপ্রসাদকে আনিবার জন্য সঙ্ঘসন্তানগণকে প্রেরণ করিলেন। পাঁচ দিন পর পর আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চারের সঙ্কল্প লইয়া তিনি সিদ্ধাসনে ঘন্টার পর ঘন্টা সমাসীন রহিলেন। শ্যামাপ্রসাদও পর পর পাঁচদিন সন্ধ্যা সাতটার সময়ে আচার্য্যের চরণে আসিবার কথা দিয়াও অত্যধিক কাজের চাপে আসিতে পারিলেন না। পরিশেষে লজ্জিত হইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন — "আমি কথা দিয়া কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না; আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন। সম্মেলনের দিন ছাড়া তাঁর দর্শনের সুযোগ আমার ঘটিবে না।" এই কথা আচার্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ বিষণ্ণতার সহিত নিরস্ত রহিলেন।

জন্মাষ্টমী সম্মেলনের দিন অপরাহ্ন, পাঁচটার সময়ে আচার্য্যদেব সম্মেলন-মণ্ডপের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে রাসবিহারী এভিনিউয়ের উপর মোটরে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলে এক

সাথে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মঞ্চের উপর উঠিয়া আচার্য্যদেব সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শকের সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠের মাল্য উঠাইয়া শ্যামাপ্রসাদের গলদেশে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদপূর্বক স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সম্মেলনান্তে আশ্রমে আসিয়া স্বীয় বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলে যখন আমি তাঁর গায়ের জামাটা খুলিয়া দিতেছিলাম, তখন তিনি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন — "বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিলাম।"

আচার্য্যের শ্রীমুখোচ্চারিত এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির যথার্থ মর্ম আমার বোধগম্য হয় নাই। আমি এইটুকু বুঝিলাম যে "কুচক্রী মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর" ষড়যন্ত্রে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দু-সম্প্রদায় নানাভাবে উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হইতেছে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শক। একমাত্র শ্যামাপ্রসাদই সদল-বলে উৎপীড়িত হিন্দুর রক্ষার্থে প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য নানাভাবে তখন হিন্দু-মহাসভা তথা শ্যামাপ্রসাদের হিন্দুসংরক্ষণ প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া আসিতে ছিলেন। সুতরাং, শ্যামাপ্রসাদকে তিনি আশীর্বাদ ও শক্তি দানপূর্বক সহায়তা করিলেন।

সঙ্ঘে শ্যামাপ্রসাদের দ্বিতীয়বার আগমন সম্বন্ধে পূজ্য স্বামীজী ওই গ্রন্থেই আরও লিখেছেন —

অক্টোবর মাসে কাশীধামে সঙ্ঘের দুর্গাপূজার উৎসব-সম্মেলনের কয়েক দিন পূর্বে আচার্য্যদেব বলিলেন — "শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এস।" সঙ্ঘ-সন্তানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন — "শ্যামাপ্রসাদ কি এখন কাশীতে এসেছেন?" আচার্য্যদেব বলিলেন — "হাঁ, এসেছে, খুঁজে দেখ।" খোঁজ করিতে করিতে দেখা গেল শ্যামাপ্রসাদ সপরিবার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করিতেছেন। সন্ন্যাসীরা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন — "স্বামীজি মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন, চলুন একবার আমাদের আশ্রমে।" শ্যামাপ্রসাদ বলিলেন — "মহাষ্টমীর দিন প্রাতে আমরা সকলে আশ্রমে গিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেব, স্বামীজি মহারাজেরও দর্শন করব, আশীর্বাদ নেব।"

মহাষ্টমীর দিন প্রাতে সপরিবারবর্গে শ্যামাপ্রসাদ আসিলেন। মহা মায়ের চরণে অঞ্জলি নিবেদনপূর্বক আচার্য্যদেবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

আচার্য্যদেবের সহিত শ্যামাপ্রসাদের কী বিষয়ে আলাপ হইল, তাহা কেহ জানিল না। শ্যামাপ্রসাদের প্রতি আচার্য্যদেবের এই আকর্ষণ ও মনোযোগের এবং পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ দানের মর্ম তখন ভাবিয়া না পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি।

এখন প্রশ্ন সে সময় দেশে অনেক বড় বড় নেতা ও ব্যক্তি থাকতেও তিনি শ্যামাপ্রসাদের প্রতিই এত আকৃষ্ট হলেন কেন? কেন তাঁকে তিনি বিশেষ শক্তি ও আশীর্বাদ দিলেন?

এ-প্রসঙ্গে যুগাচার্য জীবন চরিতকার বেদানন্দজী লিখেছেন —

'বৃটিশের সহিত রাজনীতির পাশাখেলার মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদের পরাজয় ও বাঙালী জাতির আসন্ন মহাবিপর্যয় ও মহামৃত্যু কীরূপে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতে ছিল। যাহার পরিণামে বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ববিলোপের পরিস্থিতি ঘনীভূত হইতেছিল, স্বীয় সর্বদর্শী দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যদেব অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই উদ্বেগ, আতঙ্ক ও প্রতিকার চিন্তা প্রচেষ্টায় তিনি আহার নিদ্রা-বিশ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য শেষ তিনটি বৎসর তিনি বাঙালির প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকের কাছে গিয়া আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন — "আপনারা বুঝিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি বাঙালি জাতি ধ্বংসোন্মুখ। এমনি সময় আসছে সামনে, যখন বাঙালি জাতি পাগলের মতো ছুটে বেড়াবে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবে না, পোকামাকড়ের মতো পথে ঘাটে পড়ে মরবে। আপনারা আমার পিছনে দাঁড়ান। আমি বাঙালী জাতির রক্ষার একটা চেষ্টা করে যাই।"

আচার্য্যের কথায় অনেকেই কান দেন নাই; কেহ কেহ এক-আধটু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। তথাপি, আচার্য্য উপেক্ষিত, অপমানিত হইয়াও নেতাদের ও ধনী ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্বামী নির্মলানন্দজীর বক্তব্য এখানে বড়ই প্রাসঙ্গিক, যা তিনি তাঁর প্রণব, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গের হিন্দু ও সমাজ বিবর্তন ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছেন —

"তাৎক্ষণিক রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভয়াবহতা ও হিন্দুর আসন্ন বিপর্যয় আচার্যকে এতই উদ্বিগ্ন করে তোলে যে তা ধর্মগুরু হয়েও তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত সংযোগ রক্ষা করে বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগঠন আন্দোলনকে পরস্পর অনুপূরক ও পরিপূরকরূপে গ্রহণ করেন। এবং বলেন — হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক সংগ্রাম করুক, আর আমরা করি গ্রামগুলির সংগঠন। তিনি বি সি চ্যাটার্জী, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রায়শই ডেকে আনতেন নিজের কাছে, উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ জানতেন, তাঁর আয়ুষ্কাল স্বল্প। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে আপন কণ্ঠস্থিত মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে করেন আশীর্বাদ ও করেন শক্তিসঞ্চার। স্বীয় বিশ্রাম কক্ষে এসে প্রসন্ন হাস্যে বলেন — "বিশ্বহিন্দুর সম্মুখে দাঁড়াতে পারে সেই নেতা ঠিক করে দিয়ে গেলাম।"

স্বামী প্রণবানন্দজী কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন শ্যামাপ্রসাদকে তিনি তাঁর আশীর্বাদ ও শক্তি দিলেন তা এ পর্যন্ত জানা গেলেও, এখনও জানা হয়নি তাঁর আশীর্বাদ ও শক্তি গ্রহণের অধিকারী হতে পারেন একমাত্র শ্যামাপ্রসাদই। যেজন্য তিনি বারবার শ্যামাপ্রসাদকে ডাকতেন। সে কারণটি কি? সে কারণ জানতে হলে আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 'শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ' নামক গবেষণা গ্রন্থটি। কারণ, আমরা সাধারণত যে সকল ইতিহাস পড়ি তার কোনটিতে কতখানি সত্য ঘটনা বর্ণিত আর কোনটিতে মনগড়া তথ্য পরিবেশিত এনিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কোনও কোনও সময় ওঠেও। তাই যথার্থ ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় — ইংরাজ রাজত্বে মুসলমান শাসকদের হাতে যখন বাংলার হিন্দুর স্বার্থ একের পর এক ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, তখন দেশের সব থেকে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস নির্বিকার। ওই হিন্দু নাম ও পদবী যুক্ত কোনও ব্যক্তিই হিন্দুর প্রতি বঞ্চনা ও অবিচারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি, বিচলিত বোধ করেননি। কিন্তু সে সময় একজন মাত্র ব্যক্তিরই হৃদয়কে ব্যথাহত, মনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল — তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে গবেষক ডঃ সিংহ তাঁর গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদের 'হিন্দুত্ববাদীরূপে আত্মপ্রকাশের বহু ঘটনাই তুলে ধরেছেন। তারই কিছু এখানে উল্লেখ করছি — শ্যামাপ্রসাদ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারমুক্ত, কিন্তু বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বাঙালী হিন্দুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁর চিত্ত চিন্তাভারাক্রান্ত। কংগ্রেস নেতারা সবাই হিন্দু; কিন্তু হিন্দুস্বার্থ বিপন্ন দেখেও তাঁরা উদাসীন। হিন্দু জনতা কংগ্রেস বলতে অজ্ঞান। তারা কংগ্রেসের হাতে নিজেদের ভবিষ্যত সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। এদিকে সুভাষচন্দ্রকে

বিতাড়নের পর কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত; কেউ সুভাষবাদী, কেউ গান্ধীবাদী। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে ব্যস্ত। বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার অবকাশ কোথায়? যখন Calcutta Municipal Bill ÛõÑ Secondary Education Bill-এর মতো 'কালাকানুন' পাশ করানোর উদ্যোগ চলল, তখন শ্যামাপ্রসাদ বাধ্য হয়ে তাঁর শিক্ষাজগতের নির্বাসন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে তৈরি হলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর যে দলের প্রতি সমর্থন ছিল সে হল কংগ্রেস। তিনি শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গিয়ে বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে আধমরা স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব বিপন্ন হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু কেউ যেন সাম্প্রদায়িক বলে মার্কা না মারে নীতি নেন। ফলে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীই কম্পিটিশনে মুসলিম তোষণে নেমে পড়ে। কেউই খোলাখুলি হিন্দুদের স্বার্থসংরক্ষণে এগিয়ে এল না। উপরন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের শাসনভার সুভাষচন্দ্র হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আসন সংখ্যা নিয়ে খেয়োখেয়ি করে মুসলিম লীগের হাতে অর্পণ করলেন।

তিনি আরও লিখেছেন —

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতবাসীর মতামত না নিয়ে ভারতকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করে বসল। এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত কোনও রাজনৈতিক দল করতে পারে বলে কেউ ভাবতে পারেনি। ইংরেজ ও মুসলিম লীগের আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা রইল না। মুসলিম লীগ মুক্তিদিবস পালন করল, আর বৃটিশরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কেউ এমন খালি মাঠ ছেড়ে দেয়, বিশ্বে বোধ হয় এর দ্বিতীয় নজির নেই। গান্ধীজীর রাজনীতি ক্ষেত্রে পদার্পণের পর একের পর এক পর্বতপ্রমাণ ভুলের সঙ্গে আর একটি নতুন ভুল যুক্ত হল। কংগ্রেসের ক্রমাগত ভুল সিদ্ধান্তে হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে থাকলেও সেদিকে নেতাদের খেয়াল নেই। এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ দেখলেন একমাত্র হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা করছে, সম্ভাব্যক্ষেত্রে প্রতিবাদ করছে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি হিন্দু মহাসভার দিকেই ঝুঁকলেন। এসব ঘটনাবলী ঘটাকালেই তিনি হিন্দু মহাসভার নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর বাংলায় আসেন এবং মহাসভার নতুন আদর্শ ও নীতির কথা প্রচার করেন। বীর সাভারকরের বক্তব্য তাঁর মনে রেখাপাত করে এবং ক্রমশঃ সেই প্রভাব বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশ করে। তখন সাভারকর খুলনায় মহাসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন। এই সম্মেলন হিন্দুদের মনে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তারপর শ্যামাপ্রসাদের কথায় ঃ

"He (Savarkar) presided over the Khulna Provincial Mahasabha Session. Being then greatly perturbed at the helpless position of Bengal Hindus – whom the Congress failed to rouse and protect – some of us were drawn to Savarkar's influence and it gradually took root. Nirmal Chatterjee, S. N. Banerjee, Asutosh Lahiry and others pressed me to join the Mahasabha".

শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি, এস এন ব্যানার্জি, আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ হিন্দু মহাসভা নেতাদের যথেষ্ট চাপ ছিল। তাছাড়া শ্যামাপ্রসাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর নিকট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড কে পরস্পরের অনুপূর্বক ও পরিপূরক করতে চেয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি বি সি চ্যাটার্জি, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখকে আহ্বান করে উৎসাহ দিতেন।'

স্বামী প্রণবানন্দজীর তিরোধান হয় ১৯৪১ সালে। আর দেশের স্বাধীনতা ও বাংলা বিভাজনের ঘটনা ১৯৪৭ সালে। অর্থাৎ ৭ বছর পর দেখা যায় — বাঙালী হিন্দুর সুরক্ষার জন্যই শ্যামাপ্রসাদ বাঙালী হিন্দুর নিরাপত্তার জন্য যে বাংলা বিভাজনের দাবি করেছিলেন — তাই বাস্তবায়িত হয়। বাঙালি হিন্দু মুসলমানের বর্বরোচিত অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে নিশ্চিন্তে বাঁচা ও বসবাসের একটা জায়গা খুঁজে পায়।

স্বামী প্রণবানন্দজী যেমন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্যই, হিন্দু জাতি গঠন কাজের জন্যই জগতে অবতীর্ণ, তেমনি শ্যামাপ্রসাদও হিন্দুর কল্যাণের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন যদি এযুগের যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হন, তো অন্যজনকে বলতে হয় পার্থ ধর্নুধর; একজন যদি হন গুরু রামদাস তো অন্যজন অবশ্যই ছত্রপতি শিবাজী।

বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যত যাতে সুরক্ষিত হয়। তাদের নিশ্চিন্ত বসবাসের জন্য একটা জায়গা দিতে পারার লোকই ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ; যে জন্য গান্ধীজী, নেতাজী থেকে শুরু করে বহু নেতা থাকলেও তাঁদের প্রতি হিন্দু হৃদয় সর্বস্ব প্রণবানন্দজী কোনও আকর্ষণ বোধ করেননি, তাঁদের নিজ শক্তিপ্রদান তো দূরে থাক!

শ্যামাপ্রসাদের ওই অবিস্মরণীয় কীর্তি সম্বন্ধে স্বামী বেদানন্দজী তাঁর 'যুগাচার্য্য জীবন চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন —

'আচার্য্যদেবের স্থূল লীলা সম্বরণপূর্ব্বক বিরাট সঙ্ঘদেহব্যূহে অধিষ্ঠানের প্রায় সাত বৎসর পরে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ভারত খণ্ডনপূর্বক ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগের আয়োজন করিল। ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ইংরেজের রাজনৈতিক জুয়াখেলায় মাতিয়া চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর পরিকল্পনাকে স্বীকারপূর্বক ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুই ভাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সমগ্র বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ঠেলিয়া দিবার আয়োজন হইল।

বাঙলার শরৎ বসু প্রমুখ তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতারা এক বাক্যে পাকিস্তান পরিকল্পনার ফাঁদে বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির বলিদান অনুমোদন

করিলেন। বাংলা ও বাঙালী জাতির বিনাশ ও বিলোপ অবধারিত হইল। এই সময়ে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের আশীর্বাদ ও শক্তিসমৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদের অন্তরের সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙালী হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। এদিক দিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়। বাঙলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মাধ্যমে এইরূপে আচার্য্যের বাঙলা ও বাঙালী জাতির রক্ষার সঙ্কল্প রূপায়িত হইয়াছিল।'

আজ যে বাংলায় এখনও পর্যন্ত আমরা হিন্দুরা নিরাপদে বসবাস করছি তা স্বামী প্রণবানন্দজীর শক্তি ও আশীর্বাদ ধন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই ফল একথা অস্বীকারের কোনও উপায় নেই। যদি কেউ বা কারা না জেনে বা জেনেও অস্বীকার করেন তবে তাঁদের সম্পর্কে কি বলা যাবে তা ভাষাবিদ্‌রাই সঠিক বলতে পারবেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় — স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করলেও একদল মানুষ তাঁকে ও তাঁর সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় আখ্যায়িত করে।

আর দেশ-জাতি-সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ ও তুলনাহীন ত্যাগ সত্ত্বেও আজও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভারত সরকার 'ভারত-রত্ন' বলে মনে করতে পারেননি। তাঁকে ওই সম্মানে ভূষিত করা হয়নি। অথচ এমন বহু লোককেই ওই রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হয়েছে — যাঁদের ওই সম্মান পাওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করা যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার যদিও সে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অনিচ্ছায় তা হয়নি বলে শুনেছি। অবশ্য পরবর্তী রাষ্ট্রপতির সময়ও পুনরায় সে সুযোগ বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা কেন নেননি তা তাঁরাই বলতে পারবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় যে হিন্দুরা বসবাস করছে, তারা সেদিন রাষ্ট্রপতির ওই সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কি-না জানি না।

এসব কারণে মনে হয় — বাঙালী হিন্দু তাদের রক্ষক স্বামী প্রণবানন্দজী বা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অতুলনীয় অবদানকে আদৌ স্মরণ করে বা শ্রদ্ধা করে কি? যারা পূর্বপুরুষের ঋণকে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা না করে, স্মরণ না করে — তাদের জীবনে আসে আদর্শের বিপর্যয়, অস্তিত্বের সঙ্কট। বর্তমানে দেশ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার যদি কোনও পরিবর্তন না হয়, তবে এই অকৃতজ্ঞ বাঙালি হিন্দুর জীবনে ঘোর বিপর্যয়, ঘোর অস্তিত্বের সঙ্কট ঘনিয়ে আসবেই — এ ঘটনা কেউ অন্যথা করতে পারবে না। আর সেদিনই তারা বুঝবে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী ও ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা করার পরিণাম কতখানি ভয়াবহ।

পরিশেষে বলি, স্বামী প্রণবানন্দজী যেমন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্যই, হিন্দু জাতি গঠন কাজের জন্যই জগতে অবতীর্ণ, তেমনি শ্যামাপ্রসাদও হিন্দুর কল্যাণের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন যদি এযুগের যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হন, তো অন্যজনকে বলতে হয় পার্থ ধনুর্ধর; একজন যদি হন গুরু রামদাস তো অন্যজন অবশ্যই ছত্রপতি শিবাজী। হিন্দু বিশেষত বাঙালী হিন্দুর নিকট তাঁরা দু'জনই হৃদয়-দেবতা ও চির উপাস্য — একথা অস্বীকার করলে, অবজ্ঞা করলে তার ভয়াবহ ফল সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও অবকাশই নেই।

উভয় বন্দনীয় মহাপুরুষের শ্রীচরণে স-ভক্তিপ্রণাম জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

১৯৪৬ -শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, ২০০৯ -শ্যামাপ্রসাদ নাই

হিন্দুদের পরিত্রাতা কে ?

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

কলকাতা-১

"ঘটনা ঘটতে শুরু করল ১৬ আগস্ট ভোর রাত থেকে। সেই মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাবলী বিবৃত করার ভাষা কারোর সেদিন ছিল না। হৃদয় বিদারক দৃশ্য; সকাল থেকে সমস্ত বড়-বড় রাস্তার ধারে সারি-সারি মৃতদেহ। একদল মুসলিম যুবক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হবিব মুসলিম জনতাকে সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণ বন্ধ করতে, এই ভ্রাতৃঘাতী সংকট থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানান। তারা সাময়িকভাবে নিরস্ত্র হলেও অলিতে-গলিতে প্রবেশ করে হত্যালীলা চালাতে থাকে।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা---
সরোজ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা-২

"নারকেলডাঙা রেলওয়ে কলোনিতে বসে আমরা বাইরের কোনও খবর পাচ্ছি না। মাঝে-মাঝেই দেখছি, ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল যাচ্ছে। রেলওয়ে শ্রমিকরা বললেন--- আপনারাও আক্রান্ত হতে পারেন। আপনারা চলে যান। তাঁরা বললেন, 'চারিদিকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, বাড়িঘর পুড়ছে, লুঠতরাজ চলছে। আমরা কোনওপ্রকারে শিয়ালদহ স্টেশনে এলাম। তারপর পায়ে হেঁটে লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে এগুতে থাকলাম। রাস্তার দুপাশে মৃতদেহ পড়ে আছে, ফুটপাথে আক্রমণকারীরা ঘোরাফেরা করছে।

চারিদিকে আগুন জ্বলছে। আমরা ফুটপাথ দিয়ে না গিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। অনেক কষ্টে শিয়ালদহ লরেটো স্কুলের পাশে ১২১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে আমাদের পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির অফিসে এসে পৌঁছলাম। এখানে পার্টি-কমরেডদের কাছে খবর পেলাম---সারা কলকাতা জ্বলছে।"

জনগণের সঙ্গে---জ্যোতি বসু।

দুজন কমিউনিস্ট নেতার কলমে ধরা রয়েছে কলকাতা শহরের বুকে হিন্দুদের এই চরম দুর্দশা ও করুণ দশা। এবার গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

নোয়াখালি-১

রাজগঞ্জ থানার নোয়াখালি চৌধুরী বাড়িতে সংঘটিত পৈশাচিক কাণ্ডের কাহিনি শোনা গেল সে বাড়ির একটি মেয়ের মুখে।

"১১ অক্টোবর সকাল বেলা গ্রামের একদল মুসলমান বাড়িতে এসে ভয় দেখিয়ে বলল, মুসলিম লীগের তহবিলে ৫০০ টাকা চাঁদা না দিলে আমাদের বাড়ির সবাইকে খুন করা হবে, বিষয়-সম্পত্তি লুঠ করে নেবে এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। বাড়ির কর্তারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা তাদের হাতে তুলে জীবনের নিরাপত্তা চায়। কিছুক্ষণ পরেই এক বিশাল সশস্ত্র মুসলমান জনতা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির একজন সদস্য তাদের শান্ত করতে গেলে তার মুখ থেকে কথা খসার আগেই দা দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে।

তারপর তারা বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে আক্রমণ করে। তাকে জবাই করার পর তার দ্বিতীয় পুত্রকে ধরে তার পিতার মৃতদেহের ওপর শুইয়ে চেপে ধরে মারার জন্যে। তার মা ছেলের শরীর আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তার জীবন রেহাই দেওয়ার জন্য জল্লাদদের কাকুতিমিনতি করতে থাকেন। তারা লাঠির আঘাতে তাকে অজ্ঞান করে টেনে হেঁচড়ে দূরে সরিয়ে দেয়। গুণ্ডারা তখন ঠাকুর্দার দেহের ওপর চেপে ধরা তার (মেয়েটির) বাবার দিকে নজর দেয়। মেয়েটি ঘরে লুকিয়ে ছিল। বাবাকে খুন করতে যাচ্ছে দেখে সে ঘর থেকে ৪০০ টাকা ও কিছু অলঙ্কার নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং সেগুলি পিতার জীবনের বিনিময়ে গুণ্ডার সর্দারের হাতে দেয়। লোকটি বাম হাতে টাকা ও অলঙ্কার গ্রহণ করে ডানহাতে তার পিতার শিরোচ্ছেদ করে।"

প্যারেলাল--গান্ধীজির সহচর।

শিক্ষাদীক্ষা কৃষ্টি সংস্কৃতির গর্ব সব ধূলিসাৎ। কিন্তু পরিত্রাণের পথ নেই। সারা বাংলাই তো মুসলিম লীগের শাসনে। কলকাতায় শতকরা ৭৫ জন হিন্দু ২৫ জন মুসলমানের হাতে যে মার খেল, তারপর কলকাতার হিন্দুদের নিরাপদ বসবাসের অবস্থা ছিল না। কলকাতা থেকে পালিয়ে নোয়াখালি-বরিশাল-ঢাকা-ময়মনসিংহ-ফরিদপুর-রাজসাহী-পাবনা-খুলনা-যশোর---- কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি নেই। একমাত্র নিরাপদ বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর। এমনকি হাওড়া-হুগলীও নয়। এই দুই জেলার শিল্পাঞ্চ লগুলিও মুসলমান গুণ্ডাদের করতলগত। সেগুলি অতিক্রম করে কলকাতার দিকে আসতে গেলেই হয় কণ্ঠনালী ছিন্ন;নইলে পেট ফাঁসিয়ে দেবে।

এ এক দুঃসহ অবস্থা, হিন্দুদের পক্ষে শহর ছেড়ে গ্রামে যাবে সে পথ বন্ধ। গ্রাম থেকে শহরে আসার পথও অবরুদ্ধ।

এদিকে দিল্লীতে চলছে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে দুই বিড়ালের কামড়াকামড়ি। বিচারকের আসনে ধূর্ত বিদেশী বিড়াল বৃটিশ গভর্ণর জেনালের। তিনি কখনও কংগ্রেসের দিকে মুচকি হাসেন, কখনও মুসলিম লীগকে চোখ টেপেন। বাংলার হিন্দুর পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। দল তো চারটি। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেসীরা হিন্দুধর্ম নিয়ে কথা বলে না পাছে সাম্প্রদায়িক বলে। কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগের সঙ্গে গলায়-গলায় দোস্তালিতে আবদ্ধ। মুসলীম লীগ মুসলমানদের স্বার্থ যোলো আনার জায়গায় বত্রিশ আনা আদায় করে নিচ্ছে। হিন্দু মহাসভা শক্তিহীন---আইনসভায় মাত্র একজন সদস্য। তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ ঃ বাঘের বাচ্চা বাঘ। একাই একশো, তিনি কংগ্রেসী নেতৃত্বকে বললেন ঃ ভারত ভাগ হলে বাংলা ভাগ করতেই হবে; ওসব যুক্তবঙ্গের বেলুন ঝুলিয়ে ও বঙ্গসংস্কৃতির মলম লাগিয়ে ইসলাটমী বর্বরতা ও লাম্পট্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। বাংলার হিন্দু প্রধান অংশকে মুসলমান প্রধান অংশ থেকে আলাদা করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে।

নোয়াখালি-২

"গোপাইরবাগে দাসেদের বাড়িতে গেলাম। এটি একটা স্বচ্ছল পরিবার ছিল। পান সুপারী ও পাট বিক্রি করে মাসিক আয় ছিল দু'হাজার টাকার মতো। দাঙ্গার সময় এই বাড়ির ২১ জন পুরুষকে খুন করা হয়। ১৯ জন মহিলা বিধবা হন। সমস্ত বাড়িঘর পুড়ে ছাই করা হয়। রাসরাম, কালীকমল ও শশী পাটোয়ারী এই তিন ভ্রাতার প্রকাণ্ড পরিবারটিকে সবংশে সমূলে ধবংস করা হয়।" তথাকথিত মানুষ কি পৈশাচিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হতে পারে, তার পরিচয় মেলে এই বাড়ির ঘটনায়। স্বামীদের যখন হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে চেপে পোড়ানো হচ্ছিল, তার পাশেই চলছিল মেয়েদের ওপর গণধর্ষণ। এই বর্বরতার কোনও সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় কি?

অধ্যাপক নির্মল বসু--গান্ধীজির সফরসঙ্গী।

১৯৪৬ থেকে ২০০৯। মাত্র ৬৩ বছরের ব্যবধান; কিন্তু পরিস্থিতির ঘটে গেছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ১৯৪৬ সালে কলকাতা এবং নোয়াখালি ও ঢাকা সমেত সারা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠেছিল। হিন্দুর প্রাণ যাচ্ছে, হিন্দুনারীর মান-ইজ্জত যাচ্ছে, হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হচ্ছে, বিষয়-সম্পত্তি লুঠপাট হচ্ছে আর উল্লাসে জল্লাদের দল জিগির দিচ্ছে, উদ্দাম নাচ নাচছে। হিন্দুদের

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ ঃ বাঘের বাচ্চা বাঘ। একাই একশো, তিনি কংগ্রেসী নেতৃত্বকে বললেন ঃ ভারত ভাগ হলে বাংলা ভাগ করতেই হবে; ওসব যুক্তবঙ্গের বেলুন ঝুলিয়ে ও বঙ্গসংস্কৃতির মলম লাগিয়ে ইসলামী বর্বরতা ও লাম্পট্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। বাংলার হিন্দু প্রধান অংশকে মুসলমান প্রধান অংশ থেকে আলাদা করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। তাঁর সেই দুর্বার আন্দোলনেরই ফল এই পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দুদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু সে সুখ বেশিদিন কপালে সইল না। ইতিমধ্যে ৬৩ বছর পার হয়েছে। স্বাধীনতার ছয় বছরের মাথায় কাশ্মীর বাঁচাতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ নিজের প্রাণ দিলেন। কংগ্রেসের ৩০ এবং সিপিএমের ৩২----মোট ৬২ বছর পশ্চিমবঙ্গ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষী তথা মুসলিম মনতোষিণী শাসনে আছে। তারা বাংলাদেশী মুসলমান

ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে ভরিয়ে নির্বাচন জেতার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই ফাঁকে বাংলাদেশের গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য হয়ে চলেছে একে-একে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মুসলমানদের চাচাতো-ভায়েরা গ্রামের পর গ্রাম হিন্দুশূন্য করে চলেছে এবং পাঁচটি হিন্দুপ্রধান জেলাকে মুসলমানপ্রধান করে তুলেছে।

পদ্ধতি একই---হিন্দু মেয়ে অপহরণ, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি পোড়ানো, মন্দির অপবিত্র-করণ, বিষয়-সম্পত্তি লুণ্ঠন। উপরন্তু হিন্দুবাড়িতে চুরি, ডাকাতি খুন জখম, ছিনতাই ও রাহাজানি। হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাচ্ছে। এদিকে শহরেও মুসলিম সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত চলছে। আতঙ্কিত হিন্দুদের শহর থেকে পালিয়ে মান-ইজ্জত বাঁচাবার নিরাপদ স্থান নির্দেশ করার মতো কোনও শ্যামাপ্রসাদ নেই।

হায় শ্যামাপ্রসাদ! তুমি যদি তোমার হাতে গড়া হিন্দু পশ্চিমবাংলার এই ইসলামীকরণ দেখতে পেতে!

খোস খবর ঃ ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজনও মুসলমান এম. পি. নির্বাচিত হয়নি। এবার একলাফে সাতজন মুসলমান এম পি নির্বাচিত হয়েছে। এরা সবাই হিন্দু-বিদ্বেষী সেকুলার মার্কা দলগুলির সদস্য।

এসব দলের নেতারা ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র বা আচার্য-ব্যানার্জি-মুখার্জি-ভট্‌চার্যি বা দে-দত্ত-পাল-বালা উপাধিধারী হতে পারেন;কিন্তু এরা বোধ হয় বিধর্মীর হাতে মা-বোনের মান-ইজ্জত নাশে পুলক অনুভব করেন!

প্রতিবাদী শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

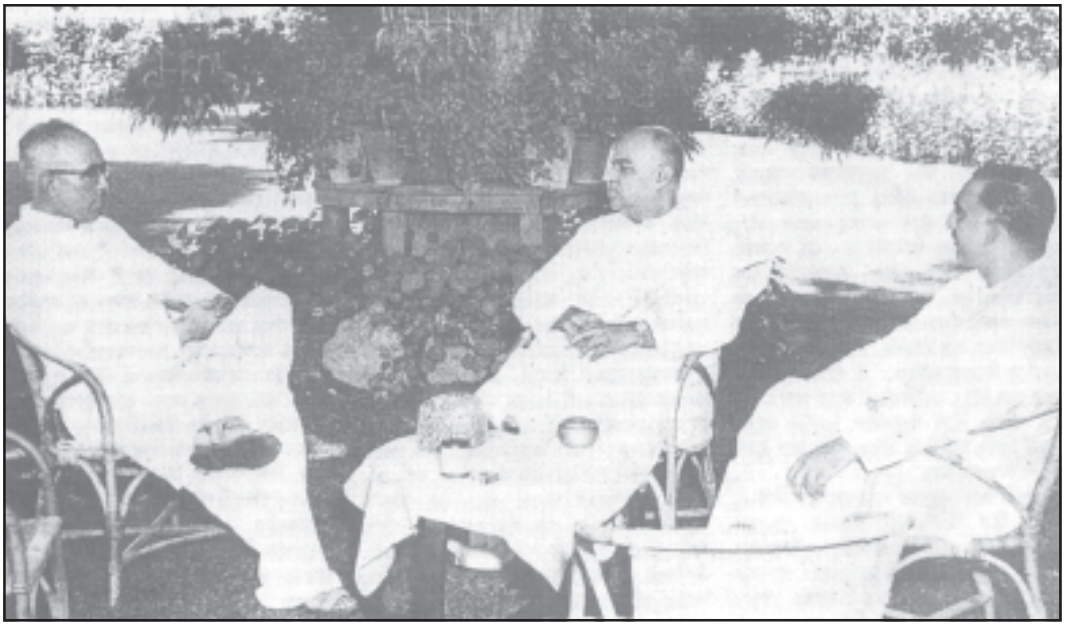

১৯৫২— কাশ্মীরের শ্রীনগরে শেখ আবদুল্লা ও বক্সী গোলাম মহম্মদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মূলত দুই ধরনের মানুষকে দেখি। কেউ বীজ বোনেন, কেউ ফসল তোলেন অথবা কেউ আদর্শের জন্য সব কিছুকে বিসর্জন দেন, কেউ আবার অর্থ-যশ-পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শকেই বিদায় দিয়ে দেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কোন দিকে রাখব---সেটা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আদর্শের জন্য তিনি যে সব ঝুঁকি নিয়েছেন, সেগুলো ব্যতিক্রমী নেতাই নিতে পারেন। আর তিনি সেই আদর্শের জন্যই স্বাধীন দেশে প্রাণ দিয়েছেন এক নোংরা চক্রান্তের শিকার হিসেবে। সেই ইতিহাস শাসকদের কলঙ্কের কালিতে ঝাপসা হয়ে আছে।

অবশ্যই তাঁর ক্ষেত্রটি রাজনীতি ছিল না। বি.এ., এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এই কৃতি ছাত্র ব্যারিস্টারী পরীক্ষায়ও সফল হয়েছিলেন।[১] দেশের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসেবেও রেখেছিলেন অতুলনীয় কীর্তি। কিন্তু বৃহত্তর কর্মের আহ্বানে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হকের ক্যাবিনেটে তিনি যেমন মন্ত্রী হয়েছিলেন, তেমনি ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রের নেহরু-ক্যাবিনেটেও তিনি পেয়েছিলেন শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর। কিন্তু তিনি দু'বারই পদত্যাগ করেছেন আদর্শের কারণে। ১৯৪২ সালে সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি উচ্চ পদটা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাশে, আর ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তোষণনীতি ও উদ্বাস্তু সমস্যার ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকারের মহত্তর প্রেরণাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল প্রাণত্যাগের দিকে----১৯৫৩ সালে তাঁর সেই মহামরণ মৃত্যু নাকি হত্যা, সেই বিচার-বিশ্লেষণটা অবশ্য এখনও হয়নি।

কাশ্মীর তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। কিন্তু কি দরকার ছিল তাঁর সেই ভয়ঙ্কর যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার? তাঁর তো কোনও ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না কাশ্মীরকে ঘিরে।

কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তির কাছে বড় ছিল নীতি, ন্যায়, আদর্শ, যুক্তি,

সততা। মৃত্যুর কথা তিনি হয়তো ভাবেননি, কিন্তু তিনি জানতেন পথের মাঝে রয়েছে নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের আশঙ্কা। তবু তিনি তাঁর আদর্শের পতাকা তুলে ধরে এগিয়ে গেছেন সেই দুর্গম লক্ষ্যের দিকে।

একটু আগের কথা বলি।

স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল দুটো ভাগ---বৃটিশ শাসিত অংশটা 'বৃটিশ ইন্ডিয়া', আর রাজা/নবাবদের অধীনে ছিল ৫৬২টি রাজ্য নিয়ে 'প্রিন্সলী স্টেটস্'। দ্বিতীয় অংশটা ছিল ছড়ানো-ছিটোনো, তাতে বৃটিশ সরকার সাধারণত হস্তক্ষেপ করত না। প্রশ্ন উঠল----বৃটিশ সরকার চলে গেলে ওই সব দেশীয় রাজ্যের কি হবে? 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স্ অ্যাক্ট'-এ বলা হল---তাঁরা ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়ানের যে কোনও একটাকে বেছে নিয়ে তার অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। ডঃ এম. ভি. পাইলী মন্তব্য করেছেন, এই ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের পৃথকভাবে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

> **তাঁর প্রয়াণটা মৃত্যু, নাকি অন্য কিছু, সেটা ইতিহাস একদিন-না-একদিন নির্ধারণ করবেই। তবে আপাতত মনে আসছে, নেহরুকে লিখিত তাঁর মাতৃদেবীর চিঠিটার কথা—'You are afraid to face facts.' সত্যিই, অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন না। বিবেককেও তখন হত্যা করতে হয়।**

সেই সূত্র অনুসারে দ্রুতগতিতে শুরু হয়ে গিয়েছিল দুই ডোমিনিয়ানের অন্তর্ভুক্তির কাজটা। সর্দার প্যাটেল ও বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ ছাড়া অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়েছে এবং গণপরিষদে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।[৩] এটা জানা যায় যে, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীনভাবে থাকতে চেয়েছে। যোধপুর ও জয়সলমীরকে লীগনেতা জিন্না টানতে চেয়েছেন। জুনাগড় চেয়েছে পাকিস্তানে যেতে। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের বুদ্ধিমত্তা, সৌজন্য ও দৃঢ়তার ফলে অধিকাংশ রাজ্যই যোগ দিয়েছে ভারতের সঙ্গে। সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল শুধু হায়দরাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীরে।

কাশ্মীরের ব্যাপারটা কিন্তু ছিল অন্যরকম।

রাজা হরি সিং হিন্দু হলেও এই রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান। 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' রাজা/নবাবকে যে কোনও ডোমিনিয়ানকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেও রাজা হয়তো ভেবেছিলেন, কাশ্মীর ভারতভুক্ত হতে চাইলে প্রজাদের মধ্যে গণ্ডগোল হতে পারে। আরও বড় কথা, সম্ভবত তিনি স্বাধীনভাবেই থাকতে চেয়েছেন। সেই কারণে তিনি তখন রহস্যজনক আচরণ করেছেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আলোচনার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করেও অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে এড়িয়ে গেছেন। লিওনার্ড মসলে মন্তব্য করেছেন, এটা ছিল তাঁর পুরোনো কৌশল।[৫]

কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস কোনও কাজে লাগেনি। পাক-বাহিনী হঠাৎ কাশ্মীরে ঢুকে রাজ্যটাকে দখল করার চেষ্টা করলে বিপন্ন রাজা হরি সিং ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারতের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। এরপরে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনও এই আবেদন নিয়ে এসেছেন দিল্লীতে। কিন্তু রাজা ভারতভুক্তির ব্যাপারে স্বাক্ষর না দিলে ভারত সরকারের পক্ষে কিছু করার উপায় ছিল না। তার ফলে ভি.পি. মেনন ও মহাজন কাশ্মীরে গিয়ে রাজার স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। এভাবেই কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত হয় এবং ২৬ অক্টোবর ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর রক্ষার কাজ শুরু করে। অবশ্য একটা অংশ থেকে গেছে পাকিস্তানের হাতে।

কিন্তু তাতে দেখা দিয়েছিল আরেক রকম সমস্যা।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন, রাজা হরি সিংও স্বাক্ষর দিয়েছিলেন 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' নথিতে---অন্য কোনও বিশেষ ধরনের চুক্তিপত্রে নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ধরনের ছাড় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা ও মুসলিম প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য কাশ্মীরকে রাখা হয়েছিল বিশেষ স্থানে। তার জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা।

কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার---

১. অন্য অঙ্গরাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ও ক্যাবিনেটের প্রধানের পদের নাম যথাক্রমে রাজ্যপাল (গভর্ণর) ও মুখ্যমন্ত্রী (চীফ মিনিস্টার)। কিন্তু কাশ্মীরের ওই দুটো পদ 'সদর-ই-রিয়াসদ্' ও 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর এই পরিপ্রেক্ষিতেই লিখেছেন, রাজ্যগুলো ছিল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কাশ্মীর ছিল সর্বোচ্চ স্তরে।

২. বিশেষ করে, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছিল। বলা হয়েছিল, শুধু ১ নং ও ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ

সেখানে আপাতত প্রয়োগ হবে---বাকিগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কাশ্মীরের গণপরিষদের মতামত জানার পর। অর্থাৎ সেই রাজ্যের পৃথক গণপরিষদ ও সংবিধান ছিল।

আসলে, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদটাই ছিল সব চেয়ে গোলমেলে---ডঃ সুভাষ কাশ্যপের ভাষায়, 'The most controversial'।[৯] এতে বলা হয়েছে, পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে হবে সীমিত, তার নিজস্ব গণপরিষদ এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

৩. ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছিলেন যে, আমাদের পার্লামেন্ট শুধু প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও যোগাযোগের ব্যাপারেই কাশ্মীরে প্রযোজ্য আইন রক্ষা করতে পারবে।

৪. ১৯৫১ সালে কাশ্মীরের গণপরিষদ তার সংবিধান রচনা করেছে। তাতে রাজ্যটাকে 'integral part of the Union of India' বলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পৃথক সংবিধান রচনাই তাকে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের চেহারা দিয়েছিল।

৫. তাছাড়া তার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছাড় ছিল---যেমন পার্লামেন্ট তার সীমানা পরিবর্তন করতে পারবে না (অন্যদের ক্ষেত্রে ৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে এটা করা যায়), ৩৫২ ও ৩৫৬ অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে গেলে রাজ্য-সরকারের সম্মতি লাগবে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশ মূলক নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও তার সম্মতি দরকার হবে, ৩৬৮ নং অনুসারে সংবিধান সংশোধন করা গেলেও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হবে না, রাজ্যপাল হবেন বিধানসভা দ্বারা নির্বাচিত---রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হতে পারবেন না ইত্যাদি (যদিও অন্যত্র ১৫৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিযুক্ত করেন)। অবশ্যই এগুলো ছিল সাময়িক ব্যবস্থা।

তিনি চেষ্টা করেও দেশ বিভাগ ঠেকাতে পারেননি, কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সুরাবর্দীর প্রচেষ্টাকে বানচাল করেছেন।

কিন্তু কাশ্মীরেও পৃথক গণপরিষদ, সংবিধান, শাসকদের পদ, বিভিন্ন বিষয়ে ছাড় ইত্যাদি জিনিসগুলো নিয়ে সঙ্গত কারণেই নানা প্রশ্ন ওঠে পড়েছিল। একই 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনে স্বাক্ষর দিয়ে কয়েকশো দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়েছিল---অথচ শুধু জম্মু-কাশ্মীরের বেলায় এত পৃথক ব্যবস্থা রাখা হল কেন----এই কথাটা তখনই অনেকের মনে এসেছে। তাহলে রাজ্যটা কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা অঙ্গরাজ্য নাকি একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র? বিশেষ করে, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ক্ষমতার (residuary power) অস্বীকৃতি এবং রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো।

এইসব ব্যাপারেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ছিল তীব্র ক্ষোভ ও আপত্তি। তিনি চেষ্টা করেও দেশ বিভাগ ঠেকাতে পারেননি, কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সুরাবর্দীর প্রচেষ্টাকে বানচাল করেছেন। এরপর তাঁর লক্ষ্য ছিল বাকি ভারতকে দৃঢ়বদ্ধ ও অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে রক্ষা করা। তাঁর মনে হয়েছিল---কাশ্মীর যদি ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য হয়, তাহলে তার জন্য এত রক্ষা কবচ কেন? এত ছাড় কি কারণে? বিভিন্ন ভাষণে তিনি বলেছেন, ভারতের আইন সেখানে খাটবে না কেন? সেই রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সেখানে অপমানিত, জাতীয় পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত। সেখানে যেতে আবার পারমিটও লাগে। কেন এরকমটা হবে?

সংসদে তিনি নেহরুকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কাশ্মীর কি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র? উত্তরে নেহরু জানিয়েছেন, সেটা ভারতেরই অঙ্গরাজ্য। শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন তুলেছেন---তাহলে তার আইন, পতাকা, সংবিধান, গণপরিষদ ইত্যাদি পৃথক কেন? তাহলে নিশ্চয় সেটা ভিন্ন রাষ্ট্র। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু, কিন্তু কাশ্মীরেও আছেন একজন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী নন)। তা ছাড়া সেখানে যেতে 'পারমিট' লাগে, কিন্তু বিহার বা ওড়িশায় যেতে কি সেটা লাগবে? 'পারমিট' কি পাশপোর্টের নামান্তর নয়?

নেহরুর মুখে উত্তর আসেনি।

শ্যামাপ্রসাদ কম্বুকণ্ঠে স্লোগান তুলেছেন---'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান।' এই রণধ্বনি দিয়েই তিনি সেদিন প্রায় সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

নিশ্চয় তাঁর বক্তব্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদী শ্যামাপ্রসাদ, দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ, শহীদ শ্যামাপ্রসাদ।

কাশ্মীর যদি ভারতের অঙ্গরাজ্যই হয়, তাহলে 'পারমিট' লাগবে কেন? এই যুক্তিকে ভিত্তি করেই কাশ্মীর সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন ১৯৫৩ সালের ১১ মে তারিখে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু ঘটে শোচনীয়ভাবে।

অদ্ভুত ব্যাপার হল---পারমিট প্রথা কাশ্মীর সরকার প্রবর্তন করেনি, সেটা চালু করেছিল নেহরু সরকার, তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল কাশ্মীর পুলিশ। আরও তাৎপর্যের বিষয়, ভারতীয় অফিসারেরা কাশ্মীরের পথে এগিয়ে দিয়েছেন, গুরুদাসপুরের ডেপুটি-কমিশনার মাধোপুর সীমান্ত ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁকে এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর শুভযাত্রা কামনা করেছেন। তাহলে ভারত সরকারের নীতি কি ছিল?

কিন্তু তারপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাখা হয় অযত্নে ও অবহেলায়। তাঁর ঘরে ফোন ছিল, সেখানে অনেকে ফোন করতেন ও ফোন ধরতেন---নিরিবিলি বিশ্রামের সুযোগই ছিল না। তাঁর ঘুম হতো না, বেড়ানোর জায়গা ছিল না। তাঁর পা ফুলে গেছে। বিস্কুট আনতে হয়েছে অন্যের মাধ্যমে। তাঁর চিকিৎসাও ঠিক মতো হয়নি। তাঁর যখন খিদে কমে গেছে, শরীর ভেঙে পড়েছে, তখনও তিনি দিন কাটিয়েছেন চরম উপেক্ষার মধ্যে। তিনি ৩১ মে থেকে ১৫ জুনের মধ্যে লিখিত পাঁচটা চিঠিতে এই সব কথা লিখে গেছেন।[১৫]

তাঁর প্রয়াণটা মৃত্যু, নাকি অন্য কিছু, সেটা ইতিহাস একদিন-না-একদিন নির্ধারণ করবেই। তবে আপাতত মনে আসছে, নেহরুকে লিখিত তাঁর মাতৃদেবীর চিঠিটার কথা---'You are afraid to face facts.' সত্যিই, অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন না। বিবেককেও তখন হত্যা করতে হয়।

অথচ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো মানুষরা মৃত্যুহীন প্রাণটা অক্লেশে দান করে ফিরে যান অমৃতলোকে। তাঁরা বেঁচে থাকেন ইতিহাস হয়েই।।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. শান্তনু সিংহ---শ্যামাপ্রসাদ : ব্যর্থ বলিদান? পৃ. ৬-৮।

২. "Their choice lay in joining and becoming an internal part of either of the two Dominions"—An Introduction to the constitution of India. p.9.

৩. Dr. B.C.Rout—Democratic Constitution of India, p.61.

৪. Vishnu Prabhakar—Sardar Patel, p.66.

৫. 'It seems that this is his usual illness whom he wishes to avoid difficult discussion. Needless to say, Mountbatten is very disappointed at this turn of events'—the last Days of the British Raj, p.213.

৬. Dr. V.D. Mahajan - The constitution of India, p.343.

৭. 'The legal consequences of the execution of Instrument of Accession by the ruler of Jammu & Kashmir can not, accordingly, be is any way different from those arising from the same fact in the case of other Indian states'—Introduction to the constitution of India, p.229.

৮. The Indian Political System, p.323.

৯.Our Constitution, p.275.

১০. G. S. Pandey ¿ùËàËåò—'However, Act. 370 is a temporary provision'---Constitutional Law of India, p.499.

১. Pandey Kedia—Essentials of the Indian Constitution, p.47.

১২. তরুণ বসু---ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

১৩. সব্যসাচী বাগচি---'বর্তমান ভারত, কাশ্মীর ও শ্যামাপ্রসাদ', শ্যামাপ্রসাদ (সম্পা: নিখিলেশ গুহ)।

১৪. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়--সম্পাদিত 'শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যু'।

শহীদ শ্যামাপ্রসাদ

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

ভারত ত্যাগ করার অন্তিম সময় পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের চিরাচরিত 'বিভেদ এবং প্রভুত্ব' ('ডিভাইড অ্যান্ড রুল') নীতি প্রয়োগ করে ভারতের বিভাজন অনিবার্য করে ফেলেছিল। আশা, যদি এই বিভজনের মারফৎ কোনও এক পক্ষে, বিশেষ করে পাকিস্তানী অংশে যদি রাজক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হয়। হিন্দু-মুসলমান, এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভূখণ্ডের বিভাজনের নীতি গৃহীত হল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন সর্বশক্তি দিয়ে এই বিভাজন রদ করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিফল হন। 'ইন্ডিয়া ইনডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। এই অ্যাক্ট পাস হওয়ার সময়ই বিভাজনের নীতিও স্থিরিকৃত হয়েছিল। কোন কোন অঞ্চল কোন রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবে। সম্প্রদায় ভিত্তিক জনসংখ্যা গরিষ্ঠতা, সীমার সরলীকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে এই বিভাজন করা হবে। এই কাজের জন্য বৃটিশ সরকার কমিশনও নিয়োগ করে ছিলেন। বৃটিশ সরকারের পক্ষে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান-এ বলা ছিল, কোনও দেশীয় রাজ্যই স্বাধীন থাকতে পারবে না। কয়েক শত দেশীয় রাজ্যকে কোনও একটি ডোমিনিয়নের (ভারত অথবা পাকিস্তান) সঙ্গে মিশে যেতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্যের রাজা অথবা নবাবের ইচ্ছাই মেনে নিতে হবে। জুনাগড়, হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীর ছাড়া সব রাজাই একের পর এক "ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন"-এ স্বাক্ষর দিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বতন্ত্র থাকার প্রয়াস করেছিলেন।

প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন শ্যামাপ্রসাদ সহজেই বুঝেছিলেন এই অনৈতিক বিভাজন ভারতের অকল্যাণ এবং অশান্তির কারণ হয়েই থাকবে। বিভাজিত ভারত ভূখণ্ডের স্বার্থরক্ষার প্রয়াসে পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়া থেকে তিনিই বাঁচিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁকে অপাংক্তেয় করে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লাভের লক্ষ্যে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ পাক-তোষণের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীর প্রশ্নেও তিনি ছিলেন অটল। এইসব বিষয়ে তাঁর দূরদর্শী, জোরাল বক্তব্যগুলিতে এক অসামান্য, অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

মহারাজা হরি সিং যখন কাশ্মীর নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, পাকিস্তান সামরিক কায়দায় কাশ্মীর দখল করার প্রয়াস করল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে তথাকথিত হানাদার নাম দিয়ে মিলিসিয়া বাহিনী সামনে রেখে পাক-সৈন্যবাহিনী ঝিলম নদীর তীর ধরে পিণ্ডি-শ্রীনগর সড়ক দিয়ে শ্রীনগর অধিকার করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। তারা উরি, বারামূল্লা, পট্টন অধিকার করে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল। শ্রীনগর বিমান বন্দর দখল করা খুব অল্প সময়েরই ব্যবধান ছিল। কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। মহারাজা হরি সিং সেই সময় ভারত সরকার ও লর্ড

মাউন্টব্যাটেনের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। সর্দার প্যাটেল জানিয়ে দেন, ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির সনদে স্বাক্ষর করলেই সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হবে। মহারাজা হরি সিং সনদে স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে ডাকোটা বিমান ব্যবহার করে শ্রীনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যুদ্ধ আরম্ভ করে। ১৯৪৭-৪৮-এ যুদ্ধ চলতে থাকে এবং পাকিস্তানী সৈন্য পেছু হঠতে থাকে। যুদ্ধ যখন উরির পশ্চিমে শঙ্খ, পাণ্ডু, ছোট কাজীনাগ ইত্যাদি ঝিলম নদীর উভয় তীরের পাহাড়ে চলছে, মাঝে, মুজাফফারাবাদ যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নজরের মধ্যে তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ বিরতির পিছনে বৃটিশ চক্রান্তের চিত্র বেশ পরিষ্কার। কাশ্মীরের অবস্থান, উপ-মহাদেশের বিচারে ষ্ট্রাটেজিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এ তথ্য সকলেই জানেন। রাশিয়া ও চীনের সীমান্ত উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরের খুবই নিকটে। এই অঞ্চলের ষাট বর্গ কি.মি. অঞ্চল বৃটিশ-ভারত সরকার কাশ্মীর মহারাজার থেকে ইজারা নিয়েছিল এবং বৃটিশ সামরিক অফিসারদের কাজে নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল। ভারত বিভাজনের কিছুদিন আগেই তারা কাশ্মীর রিয়াসতকে এই ইজারা ফিরিয়ে দেয় এবং ওই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য গভর্ণর নিয়োগ করতে বলে। গভর্ণর সেখানে পৌঁছে দেখেন সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে, বৃটিশ সামরিক অফিসাররা পাকিস্তানী বাহিনীর আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং গভর্ণরকে সেই অঞ্চল থেকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে হয়নি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। এইভাবে উত্তরী এলাকা (নর্দার্ন এরিয়া) এবং গিলগিট অঞ্চল বিনাযুদ্ধেই পাকিস্তানের অধিকারে চলে গিয়েছিল।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে তৎকালীন ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত সফল হতে পারেনি। স্থিতাবস্থা বজায় আছে। তার মূলে শ্যামাপ্রসাদের অবদানের তথা আত্মবলিদানের আজও মূল্যায়ন হয়নি। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা সেই মূল্যায়ন করে কৃতজ্ঞ জাতির সামনে তুলে ধরবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

কাশ্মীরে বর্তমানে পাক অধিকৃত অঞ্চল ভারতের দখলে থাকলে, ভারতের পক্ষে পাক ভূখণ্ডের হৃদপিণ্ডে উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ করা সহজ হয়ে যেত। সেই জন্য উরি থেকে পশ্চিম দিকে ভারত যতই অগ্রসর হবে সেই সাঁড়াশী আক্রমণের সুযোগ ততই সুবিধাজনক হবে। অতএব ছলে-বলে-কৌশলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া যাবে না। ভারত ও পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন কাশ্মীরে পাহাড়ে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন পাকিস্তানের বৃটিশ কম্যান্ডার-ইন-চীফ ও দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেন যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে টেলিফোনে বার্তালাপ করছেন। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা যে তলানিতে ঠেকেছে, মাত্র দিন সাতেক লড়বার মতো রসদ গোলাবারুদ রয়েছে, এমতাবস্থায় যে ভাবেই হোক যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে। তাই-ই হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বোঝালেন, মানবতার খাতিরে এই যুদ্ধ এবং অনর্থক রক্তক্ষয় নিষ্প্রয়োজন। এই বিবাদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে সহজেই মীমাংসা করা যাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রায় ভারতের পক্ষেই হবে কারণ ভারত ভূখণ্ড বিভাজনের নীতি বৃটিশ সরকারের মধ্যস্থতায় স্থির হয়েছিল এবং মহারাজা যে মুহূর্তে ভারতভুক্তি সনদে স্বাক্ষর করেছেন। সম্পূর্ণ কাশ্মীর রাজ্য ভারত ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে।

সর্দার প্যাটেল, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং আরও অনেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরুকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু হ্যারোইটনের ছাত্র মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শই নেবেন, বৃটিশ নিরপেক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস। পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রত্যাহার করার দাবীও করেছিলেন, "কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতবর্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপনের মূল কারণ যাই থাকুক না কেন। দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে নিরাপত্তা পরিষদ হতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রত্যাহার করার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারত কোনও সুবিধার আশা করতে পারে না। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণকারী হলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৃটেন ও আমেরিকা সহ কয়েকটি প্রধান শক্তি ভারতের অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীরে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। জম্মুর বিষয় বিবেচনার প্রতিনিধিত্বমূলক হয়নি বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই পরিষদে ভারতভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দুটি বিষয় থাকবে---একটি জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকার ভবিষ্যৎ এবং আর একটি এই রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রথমোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা যায় যে, জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারতের আত্মসম্মান রক্ষা করতে হলে যে কোনও উপায়ে শত্রুর কবল হতে এই অঞ্চলকে উদ্ধার করতে হবে। এই কারণে ভারতকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" (স্বস্তিকা---শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা, ১৯৯৯)। সত্যিই স্বাধীনতার পর থেকেই কাশ্মীর উপলক্ষ্য করে পাকিস্তান ভারতের ওপর শুধু যুদ্ধই নয়, নরহত্যার যে জেহাদ ঘটিয়ে চলেছে, তার ধারা

আজও অব্যাহত। ১৯৫০-৫১ -তেই এই মহান চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রবিদ্ এই পরিণতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দশক থেকে ভারতীয় সংসদে এবং প্রতিটি সভা সমিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমাগত দাবী করে এসেছেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্যামাপ্রসাদ মুখের কথার কোনও গুরুত্ব দেননি। তিনি ব্যবহারিক দিক দিয়ে সেই 'অবিচ্ছেদ্য' রূপটি দেখতে পাননি। সেই জন্য সমস্ত ভারতে আলোড়ন তুলে ১৯৫২ খৃস্টাব্দের ২৬ জুন লোকসভায় অভিযোগ জানালেন, যদি কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থাকে, যদি শেখ আবদুল্লার ২৪ মার্চ, ১৯৫২-র ঘোষণা মতো জম্মু-কাশ্মীরে আলাদা রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি ভারতের অন্যপ্রান্তের মানুষ জম্মু-কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য জমি কিনতে না পারেন (৩৭০ ধারা), জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য পারমিটের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়, তাহলে কীভাবে জম্মু-কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ?

তিনি জানিয়ে দেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শুধু মুখের কথায় নয়, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং ভারতমাতার প্রতি তাঁর কর্তব্য হিসাবে বিশ্বের সামনে তিনি প্রমাণ করবেন, ওই রাজ্য সত্যিই ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ৯ জুন তিনি শ্রীনগর অভিমুখে কোনও পারমিট ছাড়াই যাত্রা করেন। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোনও কর্মকর্তা বা পার্টি নেতাকে সঙ্গে নিতে অস্বীকার করেন। পাঞ্জাব থেকে জম্মু যাওয়ার পথে রাজ্য সীমায় তাকে গ্রেপ্তার করা না হলেও জম্মুতে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। পুরো ঘটনাটি আজও রহস্যাবৃত। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কি চিকিৎসা করা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিশন তদন্ত করে কোনও রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা জানিনা। কিন্তু মাতা যোগমায়া দেবী পুত্রের মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর সরকার ও ভারত-সরকারকে দায়ী করেছিলেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একক প্রয়াসে পাঞ্জাব ও বাংলার কিছু অংশ ভারতের অংশ হয়ে রইল। ভারতবাসী তথা আমরা বাঙালীরা তাঁর প্রাপ্য মর্যাদাটুকুও কি তাঁকে দিতে পেরেছি? তিনি আত্মবলিদান দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে তৎকালীন ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত সফল হতে পারেনি। স্থিতাবস্থা বজায় আছে। তার মূলে শ্যামাপ্রসাদের অবদানের তথা আত্মবলিদানের আজও মূল্যায়ন হয়নি। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা সেই মূল্যায়ন করে কৃতজ্ঞ জাতির সামনে তুলে ধরবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

সরকারি দপ্তরে শ্যামাপ্রসাদ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতির রূপকার শ্যামাপ্রসাদ

এন সি দে

পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী গত দু'বছর ধরে রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে খুবই লাফালাফি শুরু করেছেন। ভাবখানা এমনই যেন উনি এবং ওনার দলই বাংলার শিল্পের রূপকার। আর কেউ বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে কোনওদিন ভাবেননি, কিছু করেনও নি। বরং সবাই বাধা দিচ্ছেন। এককালে তাদের দলে ছিল বলে যাদের তারা বুদ্ধি জীবী বলে ডাকতেন তারাও আজ "মূর্খ" বলে অভিহিত হচ্ছেন। কারণ এরাও আজ সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে বেয়োনেট দেখিয়ে শিল্প গড়ার নজিরবিহীন কার্যকলাপের বিরোধিতা করছেন। আর বিরোধীরা? জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বামপন্থীদের জায়গা পূরণ করতে "মা-মাটি-মানুষের" লাগসই স্লোগান নিয়ে হাজির হয়ে গেছেন ফ্যাসিস্ট বামপন্থীদের দ্বারা নিপীড়িত মানুষদের পাশে। রাজ্য বিজেপি-র দুর্বল নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী আদর্শে লালিত-পালিত কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও নেত্রীগণ জনগণের কাছে হিরো সাজছেন কারণ বাঙ্গালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি।

তার এই আত্মবিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে বাঙ্গালীর শতদুঃখের মূল কারিগর বহু নিন্দিত কংগ্রেস / তৃণমূল কংগ্রেস আজ বাঙলার মা-মাটি-মানুষের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে বাজিমাত করতে নেমেছে। কিন্তু সব মানুষই স্মৃতি-বিস্মৃত হন না। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বাঙ্গালী বিদ্বেষ এখন ইতিহাস। যাঁরা কংগ্রেসের এইসব কুকীর্তি স্বচক্ষে দেখেছেন তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এসবই অজানা। তাই বাংলার শিল্পায়নে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করার আগে নয়া কংগ্রেসীদের মা-মাটি-

মানুষের আবেগপ্রবণ স্লোগানের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কংগ্রেসীদের মূল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করাটা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি।

শুরু করি একেবারে শুরু থেকে। জাতীয় কংগ্রেস দল গঠন প্রক্রিয়া থেকে। জাতীয় কংগ্রেস দল গঠনের পূর্বে সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সারা ভারতে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "রাজনারায়ণ বসুকে যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয় তাহলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে।" এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগঠিত রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ১৮৭৬ সালে ২৬ জুলাই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংস্থার কাজে দশ বছর ধরে সারা ভারত ভ্রমণ করে তিনি জনগণের মধ্যে যে অভাবনীয় জাতীয় চেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, তারই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠতে পেরেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে গান্ধীজী সেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপকার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বোম্বাইতে ডাকেননি। অথচ ডাকা হয়েছিল বৃটিশ আমলা অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমকে। এই হল কংগ্রেসের চরিত্র। অতএব কংগ্রেস শুরু থেকেই ছিল বৃটিশদের হাতে তৈরি একটি দল, যে দলের সঙ্গে দেশের মা-মাটি-মানুষের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।

ইংরেজ সেবাদাস কংগ্রেসের এ হল একটি উদাহরণ মাত্র। ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজকের নিবন্ধটির একান্ত বিষয়টি যেহেতু তা নয় তাই বিস্তারিতভাবে আলোচনায় যাচ্ছি না। এবার আর একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাব কংগ্রেস কিভাবে শুরু থেকেই চোরাবাজারি, কালোবাজারের প্রবক্তা দালাল-পুঁজিপতিদের প্রতি অনুগত থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত কিন্তু অত্যন্ত সৎ ও একরোখা। তিনি ক্ষমতায় বসেই দেখলেন একদল মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী কালোবাজারীতে মেতে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কালোবাজারী মজুতদারীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। মজুতদারদের প্রতিনিধি হয়ে বিড়লা বন্ধু রা সবরমতী আশ্রমে সেদিন সোজাসুজি স্বয়ং গান্ধীজীকে ধরেছিলেন। গান্ধীজী বিড়লাদেরই পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর ভক্ত ডঃ ঘোষকে একটি চিঠিতে নির্দেশ দিলেন যেন অবিলম্বে রাজ্য মন্ত্রিসভায় বদ্রীদাস গোয়েন্দা অথবা দেবীদাস খৈতানকে মন্ত্রী করে নেওয়া হয়। একরোখা সৎ ডঃ ঘোষ গান্ধীজীর নির্দেশ মানেননি। ফলস্বরূপ কালোবাজারী মজুতদারদের প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতাদের চক্রান্তে বেশির ভাগ এম এল এ-রা সেদিন ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে চলে যান। ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে।

প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি কংগ্রেসের বিদেশী প্রভুদের প্রতি আনুগত্যের উদাহরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখলাম দেশি মজুতদার কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্যের প্রমাণ। এই কংগ্রেসে শুরু থেকেই প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের কোনও স্থান দিল না। ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ নেহরুর চক্রান্তে শেখ আবদুল্লার কারাগারে নিহত হলেন। তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে নেহরু শেখ আবদুল্লাকেও ফাটকে ঢোকান। নেহরুর জীবদ্দশায় শেখ আবদুল্লা আর ফাটকের বাইরে আসতে পারেননি। এই কংগ্রেসের ধারাবাহিক রূপই হল তৃণমূল কংগ্রেস। এরা আজ জনগণের কাছে হাজির হয়েছে মা-মাটি-মানুষ-এর স্লোগান নিয়ে। বাংলার উন্নয়নের ঠিকাদারি নিয়ে সি পি এম আর তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা।

" "

আজীবন বাংলা ও বাঙালীসেবী শ্যামাপ্রসাদ, যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, লোকোমেটিভএই কারখানাটি বাংলাতেই স্থাপন করবেন বলে তৎকালীন বিহার সরকারের কাছ থেকে ঐ স্থানটুকু চেয়ে নিয়ে তা বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন। বাংলার মা-মাটি-মানুষের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র টানের এ এক অনবদ্য উদাহরণ।

" "

আজকের বাংলার যেক'টি শিল্প ধুঁকছে তার সবকটিই শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য তিনি বেশিদিন নেহরুর মন্ত্রিসভায় টিকতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ২ বছর ৮ মাসের মতো নেহরু মন্ত্রীসভায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপর তো নেহরুর চক্রান্তে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ইহজগতই ত্যাগ করলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্পের জন্য যা করেছেন তা এক কথায় অনন্য। সেই সময় ভারতবর্ষে শিল্প বলতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। সেই কারণে এই শিল্প মন্ত্রকটিও এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এই মন্ত্রকের মন্ত্রী হিসেবেই তিনি ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিল্পের পরিবেশ, পরিকাঠামোই যেখানে নেই সেখানে জোর করে চাষের

জমি নষ্ট করে কিছু শিল্প চাপিয়ে দিলেই যে ভারত শিল্পোন্নত হয়ে উঠবে না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ১৯৪৮ সালে গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। কারণ তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশের শিল্পনীতি না থাকলে দেশকে শিল্পোন্নত করা যাবে না।

প্রথমেই তিনি সেইসব শিল্পে হাত দিলেন যেসব শিল্প গড়ে উঠলে শিল্পের পরিকাঠামোগত অভাবটা দূর হবে। তাঁর শিল্পনীতিতে তিনি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চি ত করতে চেয়েছিলেন। শিল্প ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন করে সরকারি ও বেসরকারি শিল্পে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মূলধন সরবরাহ সুনিশ্চি ত করেন; এ ছাড়াও দুর্বল শিল্পকে সংরক্ষণ দান ও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও শ্যামাপ্রসাদেরই।

শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তুলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি নজর দিলেন রেল পরিবহন গড়ে তোলার দিকে। আগে ট্রেন চলত স্টীম লোকোমোটিভ ইঞ্জিনে। ইঞ্জিন আমদানি করা হত ইংল্যান্ড, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে। ইঞ্জিন খারাপ হলে তা সারাতেও এই দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ প্রথমেই এই নির্ভরতা থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য স্টীম লোকোমেটিভ আমাদের দেশেই নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই লোকোমেটিভ কারখানাটির স্থান নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব রেলের মিহিজাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকার চিত্তরঞ্জনে এই স্টীম লোকোমেটিভ কারখানাটির ভিত্তি স্থাপন করিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবীকে দিয়ে। দেশবন্ধু র নামেই এই কারখানাটি আজ চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস নামে পরিচিত। জায়গাটিও এই নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। একটি রেল ইঞ্জিন কারখানা গড়ে তুলতে গেলে যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন, খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ সাঁওতাল পরগনা এই অঞ্চ লের পাশেই অবস্থিত। তৎকালীন বাংলা-বিহার সীমান্তের এই জায়গাটুকু বিহারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজীবন বাংলা ও বাঙালীসেবী শ্যামাপ্রসাদ, যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই পশ্চি মবঙ্গকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, লোকোমেটিভ এই কারখানাটি বাংলাতেই স্থাপন করবেন বলে তৎকালীন বিহার সরকারের কাছ থেকে ঐ স্থানটুকু চেয়ে নিয়ে তা বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন। বাংলার মা-মাটি-মানুষের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র টানের এ এক অনবদ্য উদাহরণ। এই কারখানার তৈরি প্রথম ইঞ্জিনটি তিনি কিন্তু উপহার দিয়েছিলেন জাতিকে তার গৌরবময় প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রথম পুণ্য দিবসে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।

শুধু শিল্প নয়, তিনি খাদ্যে স্বয়ম্ভ রতা অর্জনের কথাও বিস্মৃত হননি। তিনি হিসাব করে দেখলেন এদেশে কৃষিজমি আছে প্রচুর, এখানকার কৃষকরাও কর্মঠ, সৃজনশীল ও বুদ্ধি মান। তাদের কেবল নতুন উৎপাদন পদ্ধ তির সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে এবং দিতে হবে তার সুযোগ। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি বন্ধ করতে গেলে চালু করতে হবে নতুন উৎপাদন পদ্ধ তি। আর তাতে চাই রাসায়নিক সারের ব্যবহার। এই সার কৃষকদের হাতে তুলে দিতে তিনি ঐ তৎকালীন বাংলা-বিহার সীমান্ত অঞ্চ লকেই বেছে নিলেন সিন্ধ্রি সার কারখানা গড়তে। দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভ রতা অর্জনে এই সার কারখানাটির গুরুত্ব সেকালে ছিল অপরিসীম।

এরপর ব্যাঙ্গালোরে গড়ে তুললেন হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্ কোম্পানী ও হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, সুরাটে গড়লেন অতুল প্রোডাক্টস আর রূপনারায়ণ (পশ্চি মবঙ্গ)-এ গড়লেন হিন্দুস্থান কেবল্‌স্। এই অল্প সময়ে শিল্প গড়ার কাজ যেমন চালিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটি যেন সচল থাকে সেইজন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন গড়ে শিল্পে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থাও তিনি করে নিয়েছিলেন।

প্রথমেই বলেছি শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন ভারতের প্রথম শিল্পনীতির রূপকার। এই শিল্পনীতি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের মুখেই কিছুটা শোনা যাক। ১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে ভারতের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক সভায় তার শিল্পনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'আমরা চাই না জনসাধারণের স্বার্থ-বিপন্ন করে একদল লোকের হাতে দেশের সম্পদ স্তূপীকৃত হউক। আমরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চাই যাতে দেশের সমগ্র বৈষয়িক ব্যবস্থা একীভূতভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।' বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পে মুনাফার মতলব তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি কেবল চেয়েছিলেন এই মুনাফার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত। কারখানা বা শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি শ্রমিক ও মালিক উভয়ের অবদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

শিল্পে জাতীয়করণ সম্পর্কে তার সরকারি নীতি বর্ণনা করে ডঃ মুখার্জী বলেন, 'জনগণের কল্যাণের জন্যই বর্তমান রাষ্ট্র। দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি শিল্প রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে সরকার শাসনযন্ত্রের মারফৎ শিল্প পরিচালনা করিবে না। এর জন্য গঠন করা হবে স্ট্যাটিউটরী কর্পোরেশন।

তিনি ভারতকেশরী হয়েও সর্বোপরি ছিলেন বাংলাপ্রেমী, বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদ তিনি জীবনে কখনও ভোলেননি। তিনি দেখেছিলেন পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের আগমনের ফলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চ লে জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন নতুন নতুন ছোট ছোট শহর গড়ে তুলতে আর কুটির শিল্প গড়ে তুলতে যাতে জনসাধারণ শহরমুখী না হয়ে গ্রামেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বসবাস করতে পারে। তার পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ শাসনেও তাঁর শিল্পভাবনা বাস্তবায়িত হল না — এটাই নিদারুণ পরিতাপের।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত লক্ষ লক্ষ হিন্দু এভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে।

বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

নবকুমার ভট্টাচার্য

১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ সালের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় এরকম একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল — 'হুগলি জেলার বাকুট গ্রামে এক হিন্দুবাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় বাজনা বাজানো নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ হয়। এলাকার জমিদার ছিলেন মুসলমান। তাঁর প্ররোচনায় ভাসানের দিন কিছু মুসলমান হামলা করে প্রতিমাটি ভেঙে দেয় এবং হিন্দুদের মারধর করে। পরে ওই হামলাবাজ মুসলমানদের তিন মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।' খবরটির শিরোনাম ছিল, 'কেমন আর প্রতিমা ভাঙিবে?'

এরকম হাঙ্গামা তখন মাঝে মাঝেই ঘটত — হুগলি জেলার ঘটনাটিকেও যেন দেখা হয়েছিল সেভাবেই। তখনকার হিন্দু সমাজ এ ঘটনাগুলি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বিরোধ নিয়েই তখন বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয় তখন হিন্দু সমাজের ভেতরকার নানা ধরনের কুপ্রথা কুসংস্কার, আতঙ্ক খৃস্টীয় মিশনারীদের প্রভাব নিয়ে। তখন দাঙ্গা শব্দটি প্রচলিত হয়নি। দাঙ্গা বলতে তখন বোঝাত মারামারি গুন্ডামি। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চেতনাই নাকি মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় — কোনও কোনও ঐতিহাসিক এমন কথা বললেও কথাটি সত্য নয়। ইতিহাসের ঘটনাক্রমকে বিচার করলে অবশ্য দেখা যায় স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব চেতনা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু যেমন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন তেমন সৈয়দ আমির আলি-র 'দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম' (১৮৯১) রচনার উদ্দেশ্যও ছিল ধর্মের ইতিহাসে ইসলামের স্থান প্রতিপন্ন করা। ১৮৭৬ সালে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার পরের বছরই তৈরি হয় 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। হিন্দুত্বের এই স্বধর্ম চর্চাকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। কারণ স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস থাকলেও পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব কখনও প্রকাশ পায়নি। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'হিন্দু সমাজই তাঁদের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হবে, কিন্তু মুসলমান ও ভারতবাসী অপরাপর জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দেব।' উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালী হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলির আহ্বান ছিল — 'জাতীয় ভাব জাগ্রত করতে হবে। স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করতে হবে'। ১৮৬৩ সালে আব্দুল লতিফ যখন মহামেডান লিটারারি সোসাইটি গঠন করেন তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল একই। তিনি জানতেন, মুসলমান সমাজে নানা কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতা রয়েছে — সেই ত্রুটি দূর করার জন্যে মুসলমান সমাজকে তিনি পরিচিত করিয়ে দিতে চান ইংরেজ ও হিন্দু সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট অংশের সঙ্গে, উইথ দ্য বেস্ট

রিপ্রেজেন্টেটিভস্ অফ ইংলিশ অ্যাণ্ড হিন্দু সোসাইটি'। বস্তুত উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক খুব একটা সন্দেহের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তখনকার হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কাছে বড় প্রশ্ন ছিল স্বধর্মের শুদ্ধতা রক্ষা করা। যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করতেন, হিন্দু সমাজ হল একটি জাতীয়ভাব, যার একটা শাশ্বত ঐতিহ্য রয়েছে। এই ভাবের আশ্রয়েই তিনি ভারতীয় জাতি গঠনের কথা ভাবতে পারেন এবং তাঁর সেই জাতিকল্পনায় মুসলমানদেরও স্থান ছিল। কারণ 'ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন।' কিন্তু অপর দিকে মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধ এক বিশ্ব ইসলামবাদে মিশে গিয়ে নির্মীয়মান জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করে দিল মুসলমানদের। স্বাতন্ত্র্যচেতনা মুসলমানদের বড় প্রকট ছিল, তাই তাঁদের প্রতিটি সংগঠনের নামে তাঁরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ধর্মগত পরিচয়টি।

হিন্দুরা জাতীয় চেতনা প্রসারের জন্য 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) আয়োজন করেন। এই হিন্দুমেলার নামও 'ভারতমেলা' দেওয়া হোক এমন প্রস্তাব যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ দিয়েছিলেন। হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান' সঙ্গীতে সব সম্প্রদায়ের মিলনের কথাও ছিল। অপরদিকে আব্দুল লতিফ বা আমির আলির সংগঠন কিন্তু সমসময়ই নামের আগে 'মহামেডান' পরিচয়টি বিজ্ঞাপিত করে দিয়েছিল। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা পরবর্তীকালে কংগ্রেস তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও মুসলমান পুনরুত্থানবাদীরা কিন্তু সতর্কভাবে সেই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিলেন। আমির আলি ইলবার্ট বিল আন্দোলনে (১৮৮৩) যোগ দেননি। তাঁর অনুগামীদের তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতেও নিষেধ করেছিলেন। বলা হয় ভারতের সর্বত্র মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে, মোটেই তা নয়। সেই সময় নীচের তলায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন সমান অবহেলিত ও বঞ্চিত। শিক্ষার সুযোগ তখন কেবল সারা দেশে উচ্চ এবং মধ্যবিত্তেরই ছিল এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অবশ্যই পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তার কারণ মুসলমান সমাজেরই অন্তর্ধৃত সংস্কার। অভিমানবশেই তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ বর্জন করেছিলেন আবার বাংলা ভাষার প্রতিও অভিজাত মুসলমানদের অবজ্ঞা ছিল। আব্দুল লতিফের লিটারারি সোসাইটিতে বাঙালী মুসলমানদের স্থান ছিল না। লতিফ নিম্নবর্গের মুসলমানদের জন্য বাংলাভাষা মানতে রাজি ছিলেন কিন্তু সেই বাংলাকেও তিনি আরবী ফার্সীর খিচুড়ি বানিয়ে ভদ্র করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ না নিয়ে আবার বাংলা ভাষাকে ঘৃণায় পরিহার করে মুসলমানরা নিজেদের বিপন্ন করে তুলেছিলেন। ১৮৮৬ সালে এজন্য 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'মুসলমানগণ একে বাঙালী হইয়া বাঙলা ভাল জানেন না, তাহার উপর ইংরেজী শিখিতেও তাহারা বড় কাতর। সুতরাং রাজ সরকারে তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকিবে কি প্রকারে।'

আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য ইংরেজ শাসকদেরও ঠিক দায়ী করা যায় না। সেই সময় মেয়ো এবং ক্যাম্পবেল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা নিয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য মেধাবৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ১৮৭০ থেকে মুসলমান শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের নীতিও গৃহীত হয়। মক্তব মাদ্রাসাকে সরকারি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসা, কোথাও কোথাও মুসলমান ছাত্রদের অর্ধেক বেতন বা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ১৮৮০'র পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৮২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে মুসলমান ছাত্র সংখ্যার হার ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৪৩ শতাংশ এবং মিডিল ইংলিশ স্কুলে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১৩ থেকে ৩৪ শতাংশ। কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানরা যে পিছিয়ে ছিল তার জন্য মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতাই ছিল প্রধানত দায়ী। বাঙালী মুসলমান পত্র-পত্রিকা এই অভিযোগে সরব হয়েছে। ১৮৯৯ সালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় মুসলমান সমাজের পশ্চাদগামিতার জন্য দায়ী করা হয়েছে নেতাদের অদূরদর্শিতাকে। ১৯০১ সালে 'প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একটি ছড়া — 'দেখিছ না হিন্দুগণ / পেয়েছে কি উচ্চাসন / পড়িতেছে রাজভাষা / করি প্রাণপণ। ইহাই তো উন্নতির প্রধান লক্ষণ'।

১৯০২ সালে 'ইসলাম প্রচারক'-এ লেখা হল, 'জাতির পর জাতি উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল বঙ্গীয় মুসলমানগণ কেন পিছনে পড়িয়া? ১৯০৪ সালে যদিও ওই পত্রিকাতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়, 'ইংরেজী শিক্ষার উদাসীনতা বশত আমরা ইংরাজ রাজত্বের রাজনীতিক অধিকারে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছি।' এর জন্য সমালোচনা করা হয়েছে মৌলভী আর আলেম সমাজকেও। হিন্দুদের মধ্যে যদিও এই সময় শিক্ষার প্রসারে নানা উদ্যোগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজ' ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। ১৮৭০ সালেই হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ১৮৫৫-তে বিদ্যাসাগর নদীয়া জেলায় ৫টি, বর্ধমানে ৫, হুগলী জেলায় ৫ ও মেদিনীপুর জেলায় ৫টি মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৭-৫৮-তে বিদ্যাসাগর হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি এবং নদীয়া জেলায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যে সময়ে হিন্দু সমাজ সংস্কারকেরা শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে সময় মুসলমান সমাজ সংস্কারকেরা কোরাণ পাঠে মন দিতে বলেছেন। ১৯১১ সালে 'ইসলাম প্রচারক' দুঃখ করে লিখেছিল, 'ইংরেজি আর বাংলা শিক্ষা করে মুসলমানরা ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি দিতেছে, মুহম্মদের নাম কজন জানে।' বাস্তব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুসলমানরা তখনও যথেষ্ট পিছিয়ে থাকলেও, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের নীতি তৎকালীন হিন্দু সমাজ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। উচ্চশিক্ষায় কর বসানো নিয়েও হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধার নীতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটা বিভাজন রেখা টেনে দেয়। এই প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হয় যখন মুসলমানেরা ক্রমে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী এবং স্বতন্ত্র পরীক্ষাব্যবস্থার দাবী তুললো।

১৮৮০ সালে উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দের গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলনের চেষ্টা বাংলাতেও ঢেউ এসেছিল। গ্রামে গ্রামে গো-হত্যা বিরোধী প্রচার চালানো হলে অঞ্জুমান সংগঠনগুলি গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালিয়ে মুসলমানদের গো-হত্যায় প্ররোচিত করতে থাকে। মুসলমানদের স্বেচ্ছায় গো-হত্যা বন্ধ করার আবেদন জানাতে গিয়ে স্বসম্প্রদায়ের কোপে পড়েন মীর মুশারাফ হোসেন। ১৮৯৩ সালের একটি সরকারি নির্দেশনামায় প্রকাশ্যে গো-হত্যা বা মৃত গোরুর দেহ খোলা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল — সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করা তখন প্রায় ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে যায়

মুসলমানদের। আবু জাফর শামসুদ্দীন দুঃখ করে লিখেছেন, 'তাজিয়ার মিছিল কর্ণবিদারী বাদ্যবাজনা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করত, অথচ হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিমা নিয়ে বাদ্য বাজিয়ে চললেই মুসলমানের শরীয়তী ধর্মবোধ উত্তুঙ্গে উঠত।'

'ইসলাম প্রচারক' ১৯০১ সালে স্বীকার করে নেয় মুসলমানদের মধ্যে জীবনীশক্তির বড় অভাব। ১৯০৩ সালে আবার স্বীকার করে নিজেদের বলবীর্যের উপর তাঁদের আত্মনির্ভরতা নেই। সেই প্রার্থিত জীবনীশক্তি অর্থাৎ বলবীর্য জাগ্রত করতে চাওয়া হয়েছে আরব পারস্য তুরস্কের গৌরব গাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। মুস্তাফা নুরুল ইসলামের মতে, হিন্দু এবং খৃস্টান প্রভাব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যই ইসলামের মহিমা-কীর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। তুরস্ক সম্রাটকে নন্দিত করা হলো 'মোস্লেমকুলের ভূষণ' বলে। ১৯১৯ সালেই মওলানা আকরম খান লিখেছিলেন, বিশ্বের সকল মুসলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি। এস ওয়াজেদ আলির মতো বুদ্ধি জীবীও মনে করেছিলেন, 'আরবী মুসলমানের জাতীয় ভাষা।' আপন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রাখার শুদ্ধ তা রক্ষার চেতনার সঙ্গে জাতির ধারণা মিশিয়ে একটি অন্য মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন মুসলমান নেতৃত্ব।

এস ওয়াজেদ আলীর মতো বুদ্ধিজীবীও মনে করেছিলেন, 'আরবী মুসলমানের জাতীয় ভাষা।' আপন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রাখার শুদ্ধ তা রক্ষার চেতনার সঙ্গে জাতির ধারণা মিশিয়ে একটি অন্য মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন মুসলমান নেতৃত্ব। এবং সেখানেই বিষবৃক্ষের সূচনা হল। এই বিষবৃক্ষের পরিণাম ফলতে আরম্ভ করলো (১৯০৫-১১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

এবং সেখানেই বিষবৃক্ষের সূচনা হল। এই বিষবৃক্ষের পরিণাম ফলতে আরম্ভ করলো (১৯০৫-১১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনরূপে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে সারা দেশে স্বদেশী জাগরণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু সমাজ স্বভাবতই বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে তখন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের ভেতর দিয়ে মুসলমান সমাজ দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের জাতিসত্ত্বার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। বৃটিশ শাসককের মদতে তৈরি হল মুসলিম লীগ (১৯০৬)। শিক্ষিত মুসলমানকে চাকরি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ দেখাতে আরম্ভ করল মুসলিম লীগ। মুসলমান কৃষককে ইসলামি রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে উত্তেজিত করা হয় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, এমনকী হিন্দু নারীর ওপর নির্যাতনের উসকানি ছিল। সেই সময়ের ঢাকার নবাব সালিমুল্লার মদতে এরকম প্রচার চালানো হয় যে, মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এখন হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার করলে বা হিন্দু বিধবাদের নিকা করলে আর কোনও বাধা আসবে না। পুলিন দাসের স্মৃতিকাথায় এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে — ঢাকায় মুসলমান দুর্বৃত্তরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করার সময় বলতে থাকে — 'নবাবের হুকুম আছে, আগে ওর মেয়েছেলেকে বের কর।' ইসলাম প্রচারকের মতো পত্রিকাও লিখতে বাধ্য হয়েছিল — 'একদল ভন্ড মৌলবী মুসলমানদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছে যে, তোমরা হিন্দুর গৃহ লুণ্ঠন কর। হিন্দু বিধবাদিগকে নিকা কর, হিন্দু রমণীর সতীত্ব নাশ কর।' কুমিল্লার দাঙ্গার পর স্বদেশী কবি কামিনী ভট্টাচার্য লিখেছেন — 'আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণধর গো'। ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহের জামালপুরে দাঙ্গা বাঁধে মেলার কোনও এক ঝগড়া নিয়ে। বাসন্তী প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়। মন্দিরের ওপর হামলা এবং হিন্দু মন্দিরের ওপর অত্যাচারের ঘটনাও ঘটে। স্বভাবতই এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু যুবকরাও সমানভাবে তৈরি হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে যা ছিল হাঙ্গামা পঞ্চাশ বছর পর ১৯০৭ সালে তা দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদের উন্নতি দেখে মুসলমানরা যত ঈর্ষান্বিত হয়েছে ততই তাঁরা দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে গিয়েছে। স্বদেশী ভাবাদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব থাকলেও মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। স্বদেশী নেতারা বরং বরাবরই স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সময়ের পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'হিন্দু নেতারা মুসলমানদের রীতিমতো তোষণ করেছেন'। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলমানই ইংরেজদের দালালি করেছে। এমনকী যে জিন্না ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজির ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন এবং বলেছিলেন তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি ভারতীয়, পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে বদ্ধ পরিকর, সেই জিন্নাই ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে গেলেন। ১৯২০ সালে বিচ্ছিন্ন হলেন কংগ্রেস থেকে। ১৯০৭ সালেই মুসলমান পত্র পত্রিকার ভাষা বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠে। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) বিপর্যয়ের পর ইসলাম প্রচারক পত্রিকা লিখেছিল, '২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩ বৎসরে পা দিয়া যমের বাড়ি গিয়াছে।' হিন্দু স্বদেশিকতাকে বলেছিল হিন্দু দেব-দেবীর মতোই প্রাণহীন জড়। ১৯২০ সালে মুসলিম লীগের মদতে মুসলমানদের প্রচার,স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে কয়েকটি দাঙ্গা। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নারী অপহরণ ও লাঞ্ছনার কারণে হিন্দুরা মনে করতে আরম্ভ করে তাদের বড় দুর্দিন। ক্রমে এইমত প্রবল হয়ে উঠল, মুসলমানদের যদি একটি নিজস্ব দল থাকে হিন্দুদেরই বা তা থাকবে না কেন? ১৯১৫ সালে তৈরি হলো হিন্দু মহাসভা। প্রস্তাবিত হিন্দু মহাসভা প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'মুসলমানদের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দিই নি, সে স্বাধীনতা আমাদেরও প্রাপ্য। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইলে তারা কেন তাতে বাধা দেবে?' মুসলমানদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং তার ইচ্ছেমতো হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করছে — এই দুটি বিষয়ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা যাচ্ছে, ১৮৭২ সালে হিন্দু জনসংখ্যা মুসলমানের চেয়ে চার লক্ষ বেশি ছিল। ১৯০১ সালে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে ২৬ লক্ষ বেশি হয়ে গেছে। আর ১৯২১ সালে হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ২ কোটি ১ লক্ষের কিছু কম, মুসলমান জনসংখ্যা

দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ। ১৯৩০ সালে দেবপ্রসাদ ঘোষ দেখালেন, মুসলমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৫ লক্ষে পৌঁছেছে আর হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর ধর্মান্তরণও একটি বিষয়। মোল্লা সমাজ ধর্মান্তরণে মদত দিয়ে যাচ্ছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে তা অনেকটা ব্যাহত হয়। উল্লেখ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৯২০ সালে আর একটি উত্তেজনাকর বিষয় উপস্থিত হল — মুসলিমদের হাতে নারী অপহরণ ও লাঞ্ছনার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রচার করে আক্রমণকারীরা মুসলমান।

১৯১৮ সালে কলকাতায় একটি ছোটখাটো হাঙ্গামা হয়, ১৯২৬ সালে প্রথমে কলকাতায় (এপ্রিল) পরে ঢাকায় (জুলাই), এরপর ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে এবং ১৯৪১ সালে ঢাকায় আবার দাঙ্গা হয়। সেকুলার ঐতিহাসিকরা বলেন কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকের ক্ষোভ। কিন্তু মন্দিরের ওপর আক্রমণ বা প্রতিমা ভাঙচুর এবং নারীর লাঞ্ছনার মতো ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় সেকুলার ঐতিহাসিকদের ধারণা ভ্রান্ত। ১৯২৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় ২ এপ্রিল। এই দাঙ্গায় মুসলমান আক্রমণের একটা বড় লক্ষ্য ছিল মাড়োয়ারিরা কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে মাড়োয়ারিদের প্রতিপত্তি মুসলমান সমাজের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। এছাড়া মাড়োয়ারিদের মদতে গোরক্ষিণী সভার প্রচার জোরদার হচ্ছিল। দাঙ্গা শুরু হবার পর বাঙালী হিন্দুরাও রেহাই পায়নি। বহু মুসলমান ভৃত্য বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে খুন করিয়েছিল তাঁর মাড়োয়ারি মনিবকে। ঠনঠনের কালীবাড়ি আক্রান্ত হবে এই জনরব শুনে লাঠি হকিস্টিক নিয়ে হিন্দু যুবক সচেতন হওয়ায় সে যাত্রা কালীবাড়ি রক্ষা পায়। যে যুবকরা কালীমন্দিরকে রক্ষা করেছে তাদের উদ্দেশ্যে অমৃত লাল বসু লিখেছিলেন, 'বাজিল দীপক রাগ যুবক জীবনে'। বিশেষ দাঙ্গা সংখ্যা প্রকাশ করেছিল 'শনিবারের চিঠি'। সজনীকান্ত দাস লিখলেন, 'ক্ষমা ও প্রেম নিরীহের মহত্ব নহে দুর্বলতা মাত্র'। 'হিন্দু দলবদ্ধ হউক, প্রাণ দিয়া ধর্মরক্ষা করুক'। নিরীহ হিন্দুকে মার খেতে দেখে সেদিন শনিবারের চিঠিও লিখেছিল, ঠ্যাঙানির জবাব ঠ্যাঙানি দিয়েই দিতে হবে। এরপর জুলাই মাসে আবার কলকাতা ও ঢাকায় দাঙ্গা হয়। এরপর ১৯২৮-২৯ সালে কংগ্রেস ও লীগের সম্পর্ক একরকম চুকে গেল। ১৯৪৩ সালে বাংলায় ফজলুর হকের সঙ্গে যৌথভাবে মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব'-এ পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্টের দাবি ঘোষণা করা হয় ওই প্রস্তাবে। ক্ষমতার আইনি অধিকারকে কাজে লাগিয়ে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়।

এই সংগ্রাম আজও চলছে। ১৯৪১-র জনগণনার সময় থেকে লীগ নেতারা যেভাবে এবং যে ভাষায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করেছিলেন তা এখনও চলছে। ১৯২০-৩০ থেকেই মক্তব মাদ্রাসাগুলি হয়ে উঠেছে মুসলিম পুনরুত্থানবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার প্রচারের কেন্দ্র। তাদের বলা হয় পয়দা কর। বিধবা বেওয়া বেবাক সব বিয়া কর্যা ফেল। এই প্রচার আজও মুর্শিদাবাদ নদীয়া সীমান্তে চলছে। যে সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয়েছিল তা কীভাবে জোড়া লাগবে? মি. গান্ধীকে কখনও মহাত্মা বলেননি মি জিন্না। গান্ধীর শোকবার্তায় জিন্না লিখেছিলেন " He was one of the greatest men produced by Hindu Community'.

বিশ্ব মুসলিমদের প্রবক্তা জামালউদ্দীন আফগানি ১৮৮০ সালে কলকাতায় অবস্থান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রভ্রমণ করে তাঁর ধারণা হয়, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেরূপ প্রবল হয়ে উঠছে, তাতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। এজন্য তিনি সমগ্র মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার চিন্তা করে প্যান ইসলামিজম বা বিশ্ব মুসলিমবাদের আদর্শ প্রচার করেন। আব্দুল লতিফ মহামেডান লিটারারি সোসাইটির পক্ষে তাঁকে বক্তৃতা করার অনুমতি দেন। কারণ তিনি নিজে প্যান ইসলামি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে সৈয়দ আমির আলি তাতে যোগদান করেননি। তিনি পত্র মারফত জানান, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হবে না, উপরন্তু বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপে মুসলমানের অংশগ্রহণ সমীচীন হবে না। আব্দুল লতিফও একই কারণে মহামেডান লিটারারি সোসাইটির পক্ষ থেকে যোগদান করতে অসম্মতি জানান। ইংরেজদের সহায়তায় কলকাতায় ১৮৫৩ সালে গঠন হয় অঞ্জুমান ইসলাম নামে সংগঠন। সরকারের প্রতি আনুগত্যবশত সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেনি এই সংগঠন। সরকার সিপাহী বিদ্রোহ দমন করলে অঞ্জুমান ইসলামি ১৮৫৮ সালের ১৪ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়াকে অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করে। স্বয়ং আবদুল লতিফ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখান থেকেই সম্পর্কের অবনতির আরম্ভ। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতির বীজ শুরু থেকেই, তাহলে শুধু শুধু শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বানিয়ে দোষারোপ করা কেন?

সেকালের নেতারা যে মুসলমানদের তোষণ করেছেন তা খবরের কাগজের সংবাদেই প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজী জিন্নাকে বহুবার তোষণ করেছেন। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি (১৯৩৮) সেসময় তিনিও জিন্নার মন পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। জওহরলালও নানারকমের চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু জিন্নার মন গলেনি। শ্যামাপ্রসাদ এই তোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন। এজন্য তাঁকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

বর্তমান যুবসমাজের দৃষ্টিতে শ্যামাপ্রসাদ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আগে পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনও রাজ্যের আইনানুগ ও বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। তখন ছিল বাংলা। তারপর এই খণ্ড রাজ্য সৃষ্টি হল কেন— তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং এই রাজ্য সৃষ্টিতে যাঁর অবদান সর্বাধিক, জাতি ও দেশের স্বার্থে আত্মোৎসর্গকারী সেই মহান দেশপ্রেমিক ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরলস সংগ্রামের কাহিনী জানতে চাওয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ন্যায্য দাবিও বটে। কিন্তু সরকারি নির্দেশে রচিত ইতিহাস পুস্তকে এসব বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই দেখা যায় না। বর্তমানকালে ইতিহাস আর গল্পকথা নয়; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত। এই ভাবনা থেকেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র-যুব সমাজ কতটা অবহিত, তা জানতেই ছাত্রসমাজের মুখোমুখি হয়েছেন **প্রাণ প্রতিম পাল।**

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে ভূপেন বোস এভিনিউ ধরে হাঁটলেই মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ। এই কলেজের কাছেই সিকিম মণিপাল ইউনিভার্সিটি। এখানেই এম বি এ পড়ছেন তারাকান্ত দত্ত। মাঝারি গড়নের এই যুবককে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম শুনেছি। প্লিজ, আমাকে আর এই বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের কমার্সের ছাত্রী নিলম। নীল রঙের জিন্স ও লাল রঙের টপ্ পরে ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম শুনেছেন কি? স্মার্টলি উত্তর, হ্যাঁ শুনেছি। উনি তো বিজেপি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তী প্রশ্ন করতেই ছাত্রীটি বলেন, অনুগ্রহ করে আমাকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি বরং ধোনি, শাহরুখ, মল্লিকাকে নিয়ে প্রশ্ন করুন। আমরা সবাই উত্তর দিচ্ছি। কেমন!

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র সোমশুভ্র চক্রবর্তী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সোমশুভ্র বলেন, শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তান ভাগ করেছেন। তাঁকে কম্যুনাল হিসেবে দেখা হয়। আসলে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক। ওই কলেজের ইংরাজী বিভাগের এক ছাত্রীর মতে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক), শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন হিন্দু ফান্ডামেন্টালিস্ট। কেনই বা তাঁকে আজকের যুব সমাজ মানবে! তিনিই তো দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছিলেন।

হুগলি মহসীন আইন কলেজের ছাত্র সৌরভ সেন। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যেত। তাঁকে ছাত্র সমাজের কাছে সঠিকভাবে তুলে

ধরা হচ্ছে না। এটা বাঙালীর কাছে লজ্জার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামপ্রসাদ। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কী বলছেন তাঁর সম্পর্কে? একটু জেনে নেওয়া যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজমের ছাত্র সোমিক মিত্র। নিজের ক্লাসে বসেই সোমিক বলেন, শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা-ভাবনা বর্তমান যুব সমাজের কাছে আদর্শ বলেই মনে হয়। তাঁর জন্যই হিন্দুদের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। দেশের মঙ্গলের জন্যই তিনি রাজনীতি করেছেন। তৈরি করেছেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ। যারা দেশকে প্রকৃত ভালোবাসে তারাই দলমত নির্বিশেষে শ্যামাপ্রাসাদের আদর্শকে মানবে। ওই একই বিভাগের ছাত্রী লহরী মুখার্জি। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সবাই জানবে তার কোনও মানে নেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। তবে হ্যাঁ, এটা ভীষণ গর্বের বিষয়। উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। তবে শ্যামাপ্রসাদের জন্যই যে আজকের পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি, এই কথাটা আমি মানতে পারি না। কারণ কারও একার দ্বারা তো একটা রাজ্য তৈরি করা সম্ভব নয়।

সাংবাদিকতা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অয়ন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম। আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে জানতে চাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও এক অজানা কারণে আমাদের এই মহান রাষ্ট্রনেতার ইতিহাস জানাতে উদ্যোগ নিচ্ছে না।

রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরাও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তাদের মতামত জানিয়েছেন।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এই ছাত্র সংগঠনের (এস. এফ. আই) রাজ্য সম্পাদক কৌস্তভ চ্যাটার্জিকে শ্যামপ্রাসাদ মুখার্জির আর্দশ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শ্যাামাপ্রসাদের কাজকর্ম নিয়ে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। বর্তমান যুব সমাজ ফ্যাসিজম্ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। শ্যামাপ্রসাদকে এস. এফ. আই সম্মান করে। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে তাঁর প্রতি কোনও বিরোধিতা আমার নেই।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক মোহিত সরকার বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্যিই আমাদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জনসমাজে একটা নতুন ধরনের ভাবধারা এনেছিলেন। যা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বসবাস করছি, উনি না থাকলে কবেই তা বাংলাদেশের অঙ্গ হয়ে যেত। আমি তো বলব---পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব ১০০ শতাংশ। শ্যামাপ্রাসাদের অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা মূলত এর জন্য দায়ী।

ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর মতে, ভারত নির্মাণে যাঁরা প্রথম বলিদানী হয়েছেন, তাঁদের কথা আমাদের ছাত্র-যুব সমাজ জানতে পারছে না। ৩২ বছরের বাম জমানায় পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। সিলেবাসে এইসব মহাপুরুষের জীবনী পড়ানো হচ্ছে না। দীর্ঘদিন বাম রাজত্বে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-যুবকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ কোন মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন, এটা বড় কথা নয়। তাঁর কাজটা বড় কথা। আমি শ্যামাপ্রসাদের জীবনী পড়েছি। অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে। রাজনীতি ধর্ম ছাড়া হতে পারে না। শ্যামাপ্রসাদ একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি নিজে হিন্দু হয়েও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। আজকের ছাত্র -যুবকদের তাঁর জীবনী পড়া উচিত।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নিজের জীবন দিয়ে দেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির জন্য লড়াই করে গিয়েছিলেন। দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের ওপর তিনি যে বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, আজও তা প্রাসঙ্গিক। দেশের বর্তমান ছাত্র যুব সমাজ কি এই মহান রাষ্ট্রনায়কের সঠিকভাবে জানতে পারবে? তাঁর জীবনী আদৌ কি বর্তমান প্রজন্মকে জানানো হবে? আজ তাঁর ১০৮তম জন্মবার্ষিকীতে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়।

সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করছেন প্রেমনাথ ডোগরা।

ভারতকেশরীর কারাসঙ্গী প্রেমনাথ ডোগরা

ভগবত স্বরূপ

পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে শ্রীনগর জেলে যখন রাখা হয়েছিল, সেইসময়ে তাঁর কারাসঙ্গী ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি ওই জেলেই মারা যান ২৩ জুন, ১৯৫৩ সালে।

ডঃ মুখার্জির মরদেহ যখন কলকাতায় আনা হল, সেই সময়ে দিল্লী অবধি ডোগরা ছিলেন সেই শবযাত্রার সঙ্গী। স্বর্গতঃ হংসরাজ গুপ্ত পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে একবার তুলনা করেছিলেন 'অজাতশত্রু'-র সঙ্গে। যিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সমাজের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন সরকার্যবাহ স্বর্গীয় মাধব রাও মূলে সঙ্ঘের কাজে জম্মু-কাশ্মীর পরিভ্রমণের সময় পণ্ডিত ডোগরা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন---"একবার আমি ডোগরার সান্নিধ্যে আসি এবং সেসময় সঙ্ঘের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করি। তিনি সেই অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছিলেন। জীবনের বিপদসঙ্কুল সময়েও তিনি মাথা ঠান্ডা রাখতেন। এমনকী জীবনের উপান্তেও তাঁর ইচ্ছাশক্তি অনেক যুবকদেরও লজ্জায় ফেলবে।"

পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা ১৮৯৪ সালের ২৩

অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন জম্মু শহরের ২২ কিলোমিটার দূরে সামাইলপুর গ্রামে। পিতা পণ্ডিত অনন্তরাও সম্পন্ন গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

পণ্ডিত অনন্তরাও ছিলেন রণবীর গভর্ণমেন্ট প্রেস-প্রধান। সেই সময়ে জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজ ছিলেন রণবীর সিংহ। পরবর্তীকালে তিনি লাহোরে কাশ্মীর প্রপার্টির সুপারিনটেনডেন্ট হন। কার্যসূত্রে লাহোরের রাজা ধ্যান সিংহ গ্রামে থাকতেন। সেখানেই প্রেমনাথ ডোগরা বড় হন ও শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

পণ্ডিত ডোগরা পড়াশুনায় অসাধারণ ছিলেন এবং খেলাধূলায়ও ছিলেন সমান দক্ষ। ১৯০৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন লাহোরের মডেল স্কুল থেকে এবং এফ সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি শুধুমাত্র পড়াশুনাতেই ভালো ফল করলেন না, ১০০, ৪০০ গজ, অর্ধ মাইল, এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় পদক পান এবং পরবর্তীকালে সরকারি খেতাবও পান। সেই খেলাধূলায় কৃতিত্বের জন্য একটা পকেট ঘড়ি পান, আজও সেই ঘড়ি তাঁর পরিবারের সদস্যরা সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

তাঁর কলেজ জীবনে পণ্ডিত ডোগরা ফুটবলের সেরা খেলোয়াড় হন এবং বিভিন্ন কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

কর্মজীবনে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন পণ্ডিত ডোগরা এবং ১৯৩১ সালে অবিভক্ত কাশ্মীরের মুজফঃরবাদের মন্ত্রী হন। সেইসময়ে শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলন তুঙ্গে। তখন আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠি, গুলি চালানো যেত, কিন্তু ডোগরা তা না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি বলতেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঝড়ের মতো, অনেক মানুষ তাতে ফেঁসে যায়। যদি সেই সমস্যার সমাধান করতে বল প্রয়োগ করতে হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কাজেই আন্দোলনকারীদের যদি সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাতে ক্ষতি কী?

লাঠি, বন্দুক ছাড়াই সেই সময়ের গণ্ড গোল থামলেও তিনি মন্ত্রীত্ব হারান। কারণ তদানীন্তন সরকার এটাকে ভালোচোখে দেখেনি।

১৯৩১ সালে শেখ আবদুল্লাও জম্মু যান এবং ডোগরা সমাজ আয়োজিত সভায় অংশ নেন। তৎকালে সর্দার বুদ্ধ সিংহ সেই সমাজের প্রধান ছিলেন এবং ওই সভায় স্বয়ং আবদুল্লা পণ্ডিত ডোগরার অপসারণ নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং তিনি বলেছিলেন, পণ্ডিত ডোগরাকে পুনরায় মন্ত্রীত্বে ফেরানো উচিত।

মন্ত্রীত্ব খুইয়ে প্রেমনাথ নিজেকে নিয়োগ করেন জনহিতকর কাজে। ১৯৪০ সালে তিনি জম্মু প্রজা সভার সদস্য হন এবং পরবর্তীকালে জনগণের সান্নিধ্যে আরও নিবিড়ভাবে আসেন। '৪৭-র ভারত বিভাজনের সময়ে কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হল। মহারাজ হরি সিংহ তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যান। জওহরলাল নেহেরুর বদান্যতায় এবং প্রশ্রয়ে নতুন কাশ্মীর গঠনের লক্ষ্যে নতুন প্রধান, নতুন প্রতীক, নতুন সংবিধান রচনা করলেন। শুধু তাই নয়, জাতীয় পতাকার বদলে লাল পতাকা,তাতে লাঙ্গল আঁকা। সেই পতাকা উত্তোলন করা হল।

এই কার্যকলাপ দেশহিত নয় বলে প্রজা পরিষদ জন্ম নেয় প্রেমনাথের নেতৃত্বে। এই মঞ্চ থেকে এক জাতি, এক নেতা, এক নিশান, এক সংবিধানের কথা বলা হল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার দায়ে তিনি তিনবার কারাবরণ করেন এবং কারাবাসকালে শেখ আবদুল্লার সরকার জেলে অত্যাচারও করে। সবচেয়ে পরিতাপের হল, ওই সময়ে সরকারি প্রাপ্য পেনশন বন্ধ করে দেয় আবদুল্লা সরকার।

সরকারি নির্দেশ অনুসারে তাঁকে দিল্লী বিমানবন্দরে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সেখানেই রয়ে গেলেন ডোগরা। সেখানেই তাঁর সুযোগ মেলে জহওরলালের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং তাঁর সঙ্গে ডোগরার বিস্তারিত আলোচনা হয় জম্মুর পরিস্থিতি নিয়ে। পণ্ডিত ডোগরা জনসমক্ষে আসেন ১৯৫৩ সালে প্রজা পরিষদ আন্দোলনের মাধ্যমে।

পরবর্তীকালে তিনি জনসঙ্ঘের জাতীয় নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি রাজ্য বিধাসভায় নির্বাচিত হন জম্মু কেন্দ্র থেকে। ১৯৭২ পর্যন্ত ওই কেন্দ্র থেকে প্রতিবার জিতেছেন। জম্মু-কাশ্মীরে যখনই গণভোটের প্রসঙ্গ উঠেছে তিনি বিরোধিতা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব শাসক দল ন্যাশন্যাল কনফারেন্সও মেনেছে।ঃ

সঙ্ঘের কাজে যখনই শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর) কাশ্মীর প্রবাস করতেন, তখনই ডোগরা তাঁর প্রধান সঙ্গী হতেন। পণ্ডিত ডোগরা লোকান্তরিত হন ১৯৭২ সালের ২১ মার্চ। বর্তমান লেখক মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মাওবাদী, সিপিএম ও কেন্দ্রীয় সরকার

নিশাকর সোম

দীর্ঘ প্রায় এক বছর "রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা" করব — এই কথার অজুহাত দিয়ে লালগড় তথা পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি তে সহায়তা করা হয়। লালগড়ে মাওবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি মূলত ওখানকার সিপিএম-এর নেতাদের অবদান। নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বানালেন, আর সেখানকার দরিদ্র মানুষের মাটির ঘরের মাথায় খড় বিছানোর ব্যবস্থা নেই। নিচের তলার সিপিএম কর্মীরা দেখলেন, নেতারা চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ে করে জমিদারি স্টাইলে চলাফেরা করছে। বাড়ির কুকুর বাদে সব আত্মীয়-স্বজনের চাকরির ব্যবস্থা করছেন নেতা-মন্ত্রীরা। তখন স্বাভাবিকভাবেই এইসব কর্মী নিজেদের দুঃখের অবসানের মুক্তিদূত হিসাবে মাওবাদীদের মেনে নিতে বাধ্য হন। মাওবাদীরা দু'ভাবে কাজ করতে থাকে প্রকাশ্যে — জনসাধারণের কমিটির মারফৎ এবং গোপনে। মাওবাদী কর্মীরা মাসের পর মাস রাত্রিতে "রাজনৈতিক ক্লাস" করেছেন — আর সিপিএম রাজ্য নেতারা মুখে বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবেন। কে করবেন? দুর্নীতিগ্রস্ত অনুজ পান্ডে?

এদিকে নন্দীগ্রামে পুলিশ হামলার বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে — সিঙ্গুরেও জমি হারানোর ভয়ে মানুষ প্রতিরোধকামী হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস-এর মমতা ব্যানার্জী এই পরিস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ হারালেন না। কলকাতায় ধর্ণা চালিয়ে রাজ্যপালের সহানুভূতি কেড়ে আসর জমিয়ে দিলেন। মাওবাদীরা দেখলেন এইতো সুযোগ — এই পার্টির কর্মীদের মধ্যে মিশে গিয়ে "রাজনৈতিক ভিত্তি" তৈরি করা যাবে। তাঁরা "শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র" — মাও জে দং-এর নীতি অবলম্বন করলেন। ইত্যবসরে বুদ্ধ দেববাবু-নিরুপম সেন শিল্পায়নের নামে একটার পর একটা কাজ করে চললেন। বিশেষ করে জমি দখলের ব্যাপারে লক্ষ্মণ শেঠকে দিয়ে নোটিফিকেশন দেওয়ানো হল। আবার সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ বাবু বলে ফেললেন — "ওই নোটিশ ছিঁড়ে ফেলুন।" ভাবুন, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে মমতার আন্দোলনের পেছনে এসে দাঁড়াল — সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি। এই তিনটি দল অঘোষিত "মিনিফ্রন্ট' তৈরি করল। এই মিনিফ্রন্টের নেপথ্যের প্রধান স্থপতি হলেন সিপিআই নেতা মন্ত্রী নন্দ ভট্টাচার্য। বুদ্ধ বাবুর অভ্রংলেহি মনোভাবের বিরোধী

নন্দবাবু। বুদ্ধ বাবু নানা সভায় খালি বলতে লাগলেন, "আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫"। "আমি বলে দিয়েছি মার খেয়ে কর্মীরা ফিরে আসবে না।"

এর সঙ্গে বিনয় কোঙার-বিমান বসু-শ্যামল চক্রবর্তীদের বিশ্রী মন্তব্য জনগণকে বিরক্ত করে তুলতো।

বুদ্ধ বাবুর দোদুল্যমানতা দেখা দিল - তিনি রাজভবনে একটি চুক্তি (?) না ঘোষণা না বিবৃতিতে একমত হলেন। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন পরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ড লীতে বুদ্ধ বাবুর বিরোধিতা করেন।

ইতিমধ্যে মাওবাদী সংগঠন পুরুলিয়া-মেদিনীপুর বাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চ লে গোপনে বিছিয়ে দেওয়া হল। বুদ্ধ বাবু সমানে বলে চললেন রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার কথা। বুদ্ধ বাবু মাওবাদীদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে চাননি। প্রকাশ কারাত সহ পার্টির রাজ্য কমিটির অধিকাংশ সদস্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতী হন। এদিকে লালগড়ে মাওবাদীরা পুলিশকে জরিমানা করছে, কান ধরে ওঠ-বস করাচ্ছে। লালগড়ে পুলিশ ঢোকা নিষিদ্ধ হল। টাকা দিয়ে পুলিশদের মুক্তি পেতে হল। পুলিশরা সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হল। লালগড়ের থানা বন্ধ হল — আটমাস পর খোলা হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর চেষ্টায়।

বুদ্ধ বাবু প্রকাশ কারাতের কথায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজি হলেন। কিন্তু নিরুপম সেন বললেন, "গোপনে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করা যাক।" এই মত আর এস পি দলেরও। ঠিক হল বামফ্রন্টের অনুমোদন নিতে হবে। বামফ্রন্টের সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মত দিলেন। প্রশ্ন উঠলো, রাজ্য গোয়েন্দারা কি করছিলেন? কোনও খবর নেই। শোনা যায়, গোয়েন্দাদের "সোর্স মানি" বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মাওবাদীদের মধ্যে সোর্স পাওয়া যায়নি। সিপিএম নেতৃত্ব নিজেদের ক্ষমতাগর্বে মদমত্ত। তাঁরা মনে করতেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। আছড়ে মারবো ছত্রধরকে (সুভাষ চক্রবর্তীর উক্তি) — এসব ফাঁকা আওয়াজ। এদিকে লোকসভা নির্বাচনে পার্টির বিপর্যয়ের পর সিপিএম-এর নিচের তলায় পার্টি নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এই অবস্থায় সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থির করলো কেন্দ্রের আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হবে। সাহায্য পাওয়া গেল। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম বুদ্ধ বাবুকে কার্যত ভর্ৎসনা করে বললেন, — "রাজ্য সরকার কি পঙ্গু? গোয়েন্দারা কি করছিলেন? রাজ্য সরকার সামলাতে না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দিক কেন্দ্রের হাতে। মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করুক পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"

বুদ্ধ বাবু-প্রণববাবুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। শোনা যায় প্রণববাবু বলেছিলেন, "আপনি যখন পারছেন না — তখন অন্য লোককে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব দিন।"

বুদ্ধ বাবুকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে বলা হল রাজ্যে চলে যান। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাহিনীর যৌথ অভিযানে লালগড় থানা চালু হল। লালগড় থানার দরজা আটমাস বাদে খুললো। ইতিমধ্যে পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে "এই সরকার অপদার্থ, আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ" এই মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

যৌথ বাহিনীর অভিযানের বিরুদ্ধে কয়েকটিসংবাদ-মাধ্যম প্রচার চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথাকথিত মাওবাদী নেতা কিষেনজি বলেন, "আমরা নন্দীগ্রামে মমতা-টিএমসিকে সাহায্য করেছি। মমতা এবার আমাদের সাহায্য করুক।"

মমতা ব্যানার্জি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করার জন্য এবং সিপিএম-এর কথায় চলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একহাত নিলেন। এদিকে মমতা ব্যানার্জির পরামর্শে কয়েকজন নাট্য কর্মী , চিত্র-শিল্পী ও শিল্পী-কবি রাজ্য সরকারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাওবাদীদের প্রকাশ্য ফোরাম জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে আলোচনা করলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই ছত্রধর মাহাতো কলকাতায় দু'বার সভা করেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে লালগড় থেকে পুলিশ সরিয়ে আনে।

ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তখন সিপিএম-এর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আর এস এস-কে নিষিদ্ধকরণ সমর্থন করে পার্টি মুখপত্রে লেখা লেখেন। আর সি পি আই-তো জরুরি অবস্থাও সমর্থন করেছিল, কারণ রাশিয়া ইন্দিরার পক্ষে ছিল।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ড লীর সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, "পার্টি ক্ষমতায় থাকতে পারুক না পারুক লালগড়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।" বিনয় কোঙারের বক্তব্য ছিল "পার্টিকে হাফ্ পার্টিজান লড়াইয়ের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বস্তুত বর্ধমান গোষ্ঠীর থেকে নিরুপম সেন বিচ্ছিন্ন হন লালগড় ইস্যুতে। আসলে বর্ধমান পার্টিতে নিরুপম-এর তেমন প্রভাব নেই।

যাই হোক, বুদ্ধ বাবুকে লালগড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম বুদ্ধ বাবুকে "মাওবাদীদের নিষিদ্ধ" করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বলেন।

শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদীদের জঙ্গি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে নিষিদ্ধ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে রয়েছে। কারণ সিপিএম, সিপিআই, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে। যদিও মন্ত্রী প্রতীম চ্যাটার্জি সহ বামফ্রন্টের ছোট ছোট দলগুলি নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এখানে একটা কথা স্মরণে আসছে — ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশে জরুরি অবস্থা

জারি করে আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তখন সিপিএম-এর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করণ সমর্থন করে পার্টি মুখপত্রে লেখা লেখেন। আর সি পি আই-তো জরুরি অবস্থাও সমর্থন করেছিল, কারণ রাশিয়া ইন্দিরার পক্ষে ছিল।

বর্তমানে এ রাজ্যে এক রাজনৈতিক দ্বিচারিতার দৃশ্য দেখা দিয়েছে। শাসক ফ্রন্ট দ্বিধা বিভক্ত। বিরোধী নেত্রী কখনও বলেন, "কোনও মাওবাদী লালগড়ে নেই।" তৃণমূলের অঘোষিত মুখপত্রে মাওবাদীদের সমর্থনে লেখা হয় "মাওবাদের মোড়কে আন্দোলন ধবংস করা হচ্ছে।" যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালগড়ে কাউকে যেতে বারণ করলেন ঠিক তখনই মমতার নির্দেশে একদল নাট্য শিল্পী কবি গেলেন। মমতা বললেন — "প্রয়োজনে আমি লালগড় যাবো — দেখি কে আটকায়?" এ তো রীতিমতো চ্যালেঞ্জ! আবার দু'দিন পরেই মমতা তাঁদের অঘোষিত মুখপত্র যার মালিক হলেন রাজ্যসভার তৃণমূলী সাংসদ, সেই পত্রিকায় মমতা লিখলেন — "মাওবাদীরা সিপিএম-এর বি-টিম।" এহেন রাজ্যের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের অবস্থা ফুটবলের মতো। একবার এর পায়ে আবার অন্যের পায়ে — ঠিক যেন ফুটবল অফ ডেসটিনি। আর পশ্চিমবঙ্গ তো সব জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল। এই অবস্থায় প্রয়োজন আছে একজন বলিষ্ঠ নেতার। তাই মনে পড়ে বাংলার ব্যাঘ্রশাবক ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কথা। তিনিই পারতেন এ অবস্থায় প্রকৃত কান্ডারী হতে। পশ্চিমবঙ্গ কি আর একবার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ-এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পারে না? আগামী দিন এর উত্তর দিক — এটাই কামনা প্রার্থনা।

জম্মুতে সভায় বক্তব্য রাখছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

হিন্দু জীবনধারায় সবাই নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে পারে ঃ ভাগবত

জম্মু থেকে ফিরে বাসুদেব পাল।। সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুত্বই এদেশের রাষ্ট্রীয়তা। হিন্দুত্ব — এই জীবন ধারার মধ্যেই সবাই আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে পারে। জম্মুতে শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় একথা বলেন আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ২৩ জুন জম্মুতে শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস পালিত হল। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল জোরাবর সিং সভাগার-এ বলিদান দিবস উপলক্ষেআয়োজিত এই সেমিনারের উদ্যোক্তা দিল্লীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন। 'উত্তর সীমান্তে নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন পাঞ্জাব-এর প্রাক্তন পুলিশ প্রধান কে পি এস গিল। ফাউন্ডেশনের সভাপতি কেদারনাথ সাহানী প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন। এই সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পি স্তোবদান, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত টি সি এ রঙ্গাচারী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ এম সি ভাণ্ডারি, কে এন পণ্ডিতা, লাদাখ বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি থুপস্তান ছেবাঙ্গ। সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত সেমিনার চলে। আশ্চর্যজনক হল একজনও উঠে যাননি।

এদিন বিকেলে ওই সভাগারেই অনুষ্ঠিত সভায়

প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তিনি ঋষি অরবিন্দকে উদ্ধৃত করে বলেন, সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুত্বই এদেশের রাষ্ট্রীয়তা। হিন্দুত্বের মধ্যেই সবাই আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে। বিশ্বকল্যাণের জন্যই হিন্দুত্ব আবশ্যক। সভার বিশেষ অতিথি বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং বলেন, বিজেপি এবারের লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। এজন্য কেউ কেউ আদর্শ বা তাত্ত্বিক চিন্তাধারা বদলের কথা বলছেন। এটা ঠিক নয়; নির্বাচনে হার-জিতের কারণে আদর্শ পরিবর্তন হয় না। বিজেপি কখনই হিন্দুত্ব তথা সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদকে পরিত্যাগ করবে না। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ব্রিগেডিয়ার (অব) সুচেত সিং। সভা পরিচালনা করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয় এবং ধন্যবাদ জানান কেদারনাথ সাহানী।

বিজেপির জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সভাপতি অশোক খাজুরিয়া, সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে, অধ্যাপক চমনলাল গুপ্তা, জম্মুর মহাপৌর কবীন্দ্র গুপ্তা, , ডাঃ হর্ষবর্ধন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিকেলের এই সভায় ছিল উপচে পড়া ভিড়।

পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিমূর্তি

রবীন সেনগুপ্ত, বহরমপুর।। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮০ খৃস্টাব্দে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে তাদের আইকন খুঁজে বার করার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়নি। কারণ এই দলটির উৎস হল জনসঙ্ঘ। আর জনসঙ্ঘের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সারা দেশে সুপরিচিত।

বহরমপুর শহরের একেবারে হৃদয়স্থলে জেলা কালেকটরেট অফিস ও রবীন্দ্রসদনের মধ্যস্থলে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির জন্য একটা উত্তম স্থান যেন ঈশ্বর পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বিজেপি প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছর বাদেই ১৯৮১ খৃস্টাব্দের ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতার দিন উন্মেচিত করা হয় শ্যামপ্রসাদের এই দীপ্ত ভঙ্গিমার মূর্তিটি। নিকটেই লেনিনের ও গান্ধীজীর মূর্তি থাকায় একটা প্রশ্ন জাতীয়তাবাদী মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছিল যে, তাদের পাশে ভারতকেশরীর মূর্তিটি কতটা উজ্জ্বল দেখাবে! কিন্তু এই রাজ্যের অন্যতম সেরা শিল্পী যামিনী পালের গড়া বিশালাকৃতি মুষ্টিবদ্ধ হাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ঋজু ও বিশাল দেহী শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিটি মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলাভাষীদের কাছে এক পরম অনুপ্রেরণা ও গর্বের বস্তু হয়ে ওঠে।

রেড রোড,কলকাতা

মালদা

তাঁর জন্মদিনে প্রতিবছর বিজেপির বহরমপুর নগর কমিটির উদ্যোগে মঞ্চ বেঁধে অনুষ্ঠান করা হয়। তাতে দেশভক্ত বহু নাগরিক উপস্থিত হন।

তরুণকুমার পণ্ডিত, মালদা।। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও মালদা জেলা----১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করেনি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের টানা-পোড়েনে সেদিন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়। ভৌগোলিক মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটে। মালদা জেলাও প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট---এই তিনদিন এই জেলাতে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল। শেষ পর্যন্ত হিন্দু সংখ্যাবহুল থানা গুলি ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ফর্মুলা অনুসারে এবং মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ও পরে রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে ১৫টি থানার মধ্যে মালদা ইংরেজবাজার সহ ১০টি থানা, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৮ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু ৫টি থানা ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে যায়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে হারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ১৪ থেকে লাফিয়ে ৩৫-এ দাঁড়িয়েছে তাতে বাংলা ভাগের সময় জিন্না-সুরাবর্দীরা যে পরিকল্পনা করেছিল কলকাতা সহ হুগলির পূর্ব পারের এলাকাকে পাকিস্তানভুক্ত করার তা সিপিএম এবং সম্প্রতি তৈরি টি এম সির বদান্যতায় সফল হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ মালদা জেলা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় যেমন সে সময় হিন্দুদের মান-সম্মান রক্ষা পেয়েছিল, বর্তমানে ৬০ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়াতে মালদাতে তেমনি হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার শুরু হয়েছে। আমরা ভুলে গেছি, ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে দফায়-দফায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় ৭০-৮০ লক্ষ হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে সীমান্ত পার করেছিল পূর্ববঙ্গ তথা ইসলামী পাকিস্তান। যাই হোক, ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদানকে মালদাবাসীর কাছে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০০২ সালের ১৭ আগস্ট শ্যামপ্রসাদ মুখার্জির ১০১তম জন্মদিনে মালদা পৌরসভার উদ্যোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হেড পোস্ট অফিসের দেওয়াল ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

বহরমপুর

Swastika 6 July - 2009 (Shyamaprasad Spl.)
Rs. 6.00, RNI No. 5257/57

Postal Regd. No. SSRM/Kol.RMS/W.B./RNP-048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09

100% Veg.

There is more to Vadilal than just great Ice Creams

Vadilal Happinezz PARLOUR

A new dimension of Ice Cream Sundaes, Scoops, Shakes, Sodas, and Floats with sauces and toppings of choice.
Happinezz, Where Ice Cream is a new experience, every time.

Vadilal GARDEN FRESH

Individually Quick Frozen fresh vegetables, fruits and fruit pulp.
Relish Ready to Serve delicacies Parathas, Rotis, Samosas Exported to over 35 countries

BRC UKAS

Certified by (Bureau Veritas Certification International - Denmark)
ISO 9001:2000 and
HACCP supported Food Safety Management System (ISO 22000-2005)
British Retailing Consortium (UK)
Plant Certified by Export Inspection Council of India

Vadilal makes happy times
www.vadilalgroup.com

।। দাম ঃ ছয় টাকা।।